ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম

ইসলামি বিপ- ব প্রতিষ্ঠায় ইরানের জাতীয় জাগরণের তাৎপর্য

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

এম.ফিল. গবেষক

আবদুর রাজ্জাক মিয়া
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তারিখ : ০৩ মার্চ, ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম.ফিল গবেষক আবদুর রাজ্জাক মিয়া কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত ***ইসলামি বিপ□ব প্রতিষ্ঠায় ইরানের জাতীয় জাগরণের তাৎপর্য*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ড় কপি পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে তা উপস্থাপন করার জন্য সুপারিশ করছি।

তারিখ :

প্রফেসর ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***ইসলামি বিপ□ব প্রতিষ্ঠায় ইরানের জাতীয় জাগরণের তাৎপর্য*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে কেউ গবেষণা করেনি। আমি আমার এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও কোনো ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন ও প্রকাশ করিনি।

তারিখ :

এম.ফিল. গবেষক
আবদুর রাজ্জাক মিয়া
ফার সিভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর :৩০৩
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
যোগদানের তারিখ : ০৪-০৪-২০১২

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

শুর“তে মহান আল-াহ ররাব্বুল আলামিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাঁর দয়া ও রহমত না পেলে এই গবেষণাকর্ম প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা সম্ভব হত না। বিশ্বের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি রইল অসংখ্য সালাম ও দর“দ।

আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আবদুল আলী হাওলাদার ও আমার মাতা মেহেরজান বেগম-এর প্রতি চির কৃতজ্ঞ। যাঁদের উৎসাহ ও অক্লান্ড় পরিশ্রম আমাকে উচ্চশিক্ষার পথ দেখিয়েছে। আমার জীবনসঙ্গিনী মুর্শিদা মোস্তফা (সাবেক ব্যাংকার) যাঁর অকৃত্রিম সহযোগিতায় আমি আমার এ গবেষণাকর্মকে চূড়ান্ড় রূপদিতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়াও আমার শ্রদ্ধেয় বড়ভাই বি. কে. বি. কলেজ, মুন্সীগঞ্জ-এর সহকারী অধ্যাপক ড. মির্জা মোহাম্মদ জারোয়ারখান-এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সম্মানিত প্রফেসর ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী স্যারের প্রতিবিশষভাবে কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি। তিনি আমার এ গবেষণাকর্মটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন। এছাড়াও উক্ত বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক ড. মো. মুহসীন উদ্দীন মিয়া ও অধ্যাপক ড. আব্দুস সবুর খানের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ– যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে তথ্যনির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন।

আবারও মহান আল–াহ তায়ালার প্রতি কৃহজ্ঞতা স্বীকার করত আমার শ্রম ও সাধনার সাফল্যের আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি।

এম.ফিল. গবেষক
আবদুর রাজ্জাক মিয়া
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলাঅনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩০৩
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

আলোচ্য বিষয়ঃ

প্রত্যয়নপত্র	I
ঘোষণাপত্র	II
মুখবন্ধ	III
সূচিপত্র	VI-VII
ভূমিকা	**১-৭**
প্রথম অধ্যায়ঃ	**৮-৪৩**
ইসলামি বিপ- বের পরিচয়	**৯-১৪**
ইরানের সংঘটিত ইসলামি বিপ- বের পটভূমি	১৫-১৬
উপনিবেশবাদের অস্ড়িত্ব রক্ষা ও ইসলামি চিন্ড়াধারার মূল্যোৎপাটনের হীন চেষ্টা	১৬-১৯
ইসলামউৎখাতের চর পাহলভিরাজবংশের ক্ষমতাগ্রহণ	১৯-২১
৫ জুনের রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান	২২-২৩
ইসলামকে দরবারিকরণ	২৩-২৫
সরকারি সাম্যবাদনীতি	২৬-২৭
মিথ্যা জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা	২৮-২৯

পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদ ২৯-৩১

সাংস্কৃতিক পরনির্ভরশীলতা ৩২-৩৪

অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ৩৪-৩৬

সামরিক নির্ভরশীলতা ৩৬

রাজনৈতিক পরনির্ভরশীলতা ৩৭-৪০

স্বাধীনতা দমন-পীড়ন ৪০-৪৩

দ্বিতীয়অধ্যায়ঃ ৪৪-১২৮

ইসলামি বিপ□ব প্রতিষ্ঠায় জাতীয় জাগরণের তাৎপর্য ৪৪-৫৬

ইরানের সামাজিক পরিবর্তন ৫৬

কর্মসংস্থান ও কর্মশক্তি ৫৬-৫৮

সাধারণশিক্ষা ৫৮-৬৭

উচ্চতরশিক্ষা ৬৭-৭৩

স্বাস্থ্য ৭৪-৭৬

নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতি ৭৬-৭৭

স্বাক্ষরতা ৭৭-৭৮

শিক্ষা ৭৮

কর্মসংস্থান ৭৮-৮০

স্বাস্থ্য ৮০

বিবাহ ৮০-৮১

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবী মহিলাদের প্রধান গ্রুপ	৮১-৮২
চলচ্চিত্র শিল্পে মহিলা	৮২-৮৪
ধর্মীয় সংখ্যালঘু	৮৫-৮৬
ইরানের সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তন	৮৬
সংবাদপত্র	৮৭-৮৮
রেডিও টেলিভিশন	৮৮-৮৯
বই ও বইমেলা	৮৯-৯১
চলচ্চিত্রনির্মাণ	৯১-৯৩
রাজনৈতিক পটপবিরর্তন	৯৪-৯৭
অর্থনৈতিক পরিবর্তন	৯৭-১০১
সামরিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন	১০১-১০৪
ইসলামি বিপ- বের পূর্বাপর ইরান সরকারের কর্মতৎপরতা	১০৫-১০৬
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান রেলওয়ে	১০৭-১০৮
ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়ের কর্মতৎপরতা	১০৯-১১১
ইসলামিবিপ- বের পূর্বে ইরানে সংবাদপত্র ও সাময়িকী	১১১-১১৩
ইসলামি বিপ- বের বিজয়ের পর ইরানে রসংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রাপ্তহিসাব	১১৪-১১৭
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রেডিও টেলিভিশন	১১৮-১২০
বহির্বিশ্বে-এরপ্রভাব	১২০-১২১
বিপ- ববিরোধী দলের প্রতিক্রিয়া	১২১-১২২

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের প্রতিক্রিয়া ১২২-১২৩

পাশ্চাত্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া ১২৩-১২৭

মুসলমান ও মসুলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ১২৭-১২৮

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ১২৯-১৫৮

বিপ- বেরসাফল্য বিশে- ষণ ১৩০

ইসলামিপুনর"খান ১৩০-১৩১

সম্মান ও মর্যাদাপূনর"দ্ধার ১৩১-১৩২

আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্তি ১৩২-১৩৩

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়াপত্তন ১৩৩-১৩৭

সালমান র"শদীর মৃত্যুদ"াদেশ ঘোষণা ১৩৮-১৩৯

ইসলামি সমাজব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্ড়র ১৩৯-১৪১

আলকুদস দিবসের প্রবর্তন ১৪১-১৪৩

ইরানের ইসলামি বিপ- বের সাফল্যের ভিত্তি ১৪৩-১৪৬

ইমামের জীবনী ও বৈশিষ্ট্য ১৪৭-১৪৮

বিশ্ব পরিমন্ডলে-এর প্রভাব ১৪৮-১৫০

জাতিসমূহের জাগরণে ইসলামি বিপ- বের প্রভাব ১৫০-১৫৮

উপসংহার ১৫৯-১৬১

গ্রন্থপঞ্জি ১৬২-১৬৬

ভূমিকা

ইরান পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত সমৃদ্ধিশালী একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক দেশ। ইরান শব্দের অর্থ আর্য। আর্যরা ইউরোপ থেকে এ এলাকায় এসে বসবাস শুর — করে। তাই এই এলাকার নাম ইরান রাখা হয়। অপর বর্ণনা মতে প্রাচীন ইরানের দক্ষিণাংশের একটি এলাকার নাম পার্স বা ফার্স। এখানাকার প্রাচীন বাদশাহ কোরেশে কাবির ফার্সের অধিবাসীদেরকে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এমন শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন যার প্রভাবে গোটা ইরানের সভ্যতা ‘ইরান বা পারস্য সভ্যতা’ এবং এর ভাষা ‘ফার্স বা পার্সী ভাষা’ হিসেবে আখ্যায়িত হয়। প্রাচীন ইরানের ভূখ — দজলা (Tigris) থেকে সিন্ধু উপত্যকায় এবং কাসপিয়ান সাগর (Caspian Sea) ও ককেশাস (Caucasus) থেকে আরব মহাসাগর পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত হলেও পারস্য এই বিস্ড়ৃত ভূখ ে র একটি অংশ মাত্র। এ অংশের প্রভাব সমগ্র ইরানকে প্রভাবিত করেছে।

ইতিহাসের গতিধারায় যুগে যুগে ইরানের সীমারেখার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, পারস্য সাম্রাজ্যের উন্নতি ও উৎকর্ষের যুগে সমগ্র মধ্য এশিয়া (চীন ও তুর্কিস্ড়ান), আফগানিস্ড়ান ককেশাস অঞ্চল ইরানের অন্ড়র্ভুক্ত ছিল। শাসকগোষ্ঠির পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ে ইরানের সীমানারও পরিবর্তন হয়েছে।

প্রায় চৌদ্দশ বছর পূর্বে ইরানিরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাঁর হিজরতের কয়েক বছর পর হতে বিভিন্ন দেশের শাসকদের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ শুর করেন এবং তাতে নিজ নবুওয়াতের ঘোষণা ও ইসলামের দাওয়াত লিখে পাঠান। এরই ধারবাহিকতায় তিনি ইরান সম্রাট খসর পারভেজের উদ্দেশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠান এবং আমরা জানি যে, একমাত্র তিনিই রাসুলুল াহর পত্রটির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে তা ছিঁড়ে ফেলেন। এটি তৎকালীন পারস্য রাজসভায় অনাচার ও বিশৃঙ্খলার একটি প্রমাণ। অন্য কোনো সম্রাট ও শাসক এরূপ কাজ করেননি; বরং তাঁদের অনেকেই সম্মানের সঙ্গে পত্রের জবাব দান করেন এবং উপঢৌকনও প্রেরণ করেন।

খসর তাঁর অনুগত ইয়েমেনের প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে এই বলে নির্দেশ দেন যে, নবুওয়াতের দাবিদারঐ ব্যক্তি যে তাঁর নামের পূর্বে নিজ নাম লেখার দুঃসাহস দেখিয়েছে, তাকে দ্র ততর সময়ে যেন তাঁর নিকট হাজির করা হয়। পরিনামে খসর র প্রতিনিধিরা মদিনায় না পৌঁছতেই খসর তাঁর পুত্রের হাতে নিহত হন। রাসুল (সা.) তাঁর প্রতিনিধিদের সম্রাট খসর নিহত হওয়ার খবর দিলে তাঁরা প্রথমে বিশ্বাস করেননি। কিন্তু তাঁরা ইয়েমেনে ফিরে এসে জানতে পারল যে, রাসুল সত্যই বলেছেন। ইয়েমেনের শাসনকর্তাসহ অনেকেই এ ঘটনায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইয়েমেনের অধিবাসী অনেক ইরানিও এ সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় যে,

সে সময়ে ইয়েমেনের শাসনভার শতভাগ ইরানিদের হাতে ছিল এবং প্রচুর ইরানি সেখানে বসবাস করত।

অবশ্য প্রথম যে ইরানি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তিনি হলেন সালমান ফারসি। মহানবীর জীবদ্দশায় স্বল্প সংখ্যক ইরানির ইসলাম ধর্ম গ্রহণ মূলত অন্য ইরানিদের সত্যকে জানার যথেষ্ট সুযোগ এনে দেয়। যেমন মুর্তজা মুতাহারী বলেন:

> পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি ইরানিদের আগ্রহ ইসলামের আবির্ভাবের সময় হতেই শুর“ হয়। মুসলিম যোদ্ধাদের মাধ্যমে ইসলামের পবিত্র বাণী ইরানে আসার পূর্বেই ইয়েমেনে অধিবাসী ইরানিদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সাগ্রহে কোরআনের বিধি-বিধান পালন শুর“ করেছিল, এমনকি তারা চরম উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামি শরীয়তের প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত এবং ইসলামের পথে নবী (সা.)-এর বিরোধীদের সঙ্গে সংগ্রামেও ব্যাপৃত হয়েছিল। (মুতাহারী, ২০০৪: ৩৬)

প্রাচীন ইরান আর্য সংস্কৃতির অধিকারী হলেও ৩৬২ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওমর ফার“ক (রা:)-এর শাসনকালে আরবগণ কর্তৃক ইরান বিজিত হয়। তদানীন্ড়ন ইরানের অধিবাসীরা তাঁদের পুরোনো যারতুস্ড়ি ধর্ম ত্যাগ করে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আর্য সংস্কৃতি ত্যাগ করে ইসলামি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অনুসারী হয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল ধরে এই ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ইরান অত্যন্ড় গুর“ত্বের সাথে লালন করে আসছিল এবং পৃথিবীর যে প্রান্ড়েই ইরানি বংশদ্ভুত শাসকগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন তাঁরাও

সেই অঞ্চলে এই ইসলামি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। (খান, ২০১৭: ১৯০)

ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র গঠনের পেছনে রয়েছে ধারবাহিক ইসলামি সংস্কৃতি এবং সচেতনভাবে গড়ে তোলা আন্দোলন। ইমাম খোমেনী (র.) ছিলেন তার সুদক্ষ নির্মাতা।

ইমাম খোমেনী (র.) তাঁর আন্দোলনের প্রথম দিকে রেজাশাহ পাহলভির শাসনামলে ইরানকে পশ্চিমা শক্তির নির্দেশে পরিচালনার বিরোধিতা করেন। রাজনীতিতে আদর্শবাদ প্রবর্তনের জন্য সামাজিক বিভিন্ন পর্যায়ে ইরানের ধর্মীয় নেতারা কাজ করছিলেন। ইরানের শাহবের বির"দ্ধে তাঁদের আন্দোলনকে শাণিত করার মতো জনমত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৬২ সালে শাহের সরকার কর্তৃক পাশ করা জেলা পরিষদ আইনে নির্বাচনে প্রার্থিতা এবং নির্বাচিতদের শপথের বিষয়ে বিধি-বিধানে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত বিধানের বির"দ্ধে আলেমদের গড়ে তোলা আন্দোলনে তিন মাসের মাথায় রেজা পাহলভি তা বাতিল করতে বাধ্য হন।

ইমাম খোমেনী (র.) ধর্মীয় প"িতদের নিয়ে কোম শহরে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক শুর" করেন। ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বের নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রচলিত সরকারের বির"দ্ধের সমালোচনাকে তিনি রেজাশাহ পাহলভির বির"দ্ধে সমালোচনায় পরিণত করেন। ১৯৬৯ সাল থেকে ইমাম খোমেনী (র.)

ইরাকের নাজাফে নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করার সময় ইসলামি সরকার গঠনের ধারণা তথা 'বেলায়াত-ই-ফাকিহ' সম্পর্কিত বক্তৃতামালা উপস্থাপন করেন। যার মূল কথা ছিল ইসলামি আইনজ্ঞদের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার, ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং আদর্শকে ধর্মীয় বিধানের ন্যায় গুর"ত্ব দেয়া। তিনি চিন্ড়াবিদ ও বিশেষজ্ঞদের এই ধারণার ব্যাপারেব্যাপক বিচার-বিশে- ষণের আহ্বান জানান এবং তা ইরান এবং ইসলামি দেশসমূহে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বির"দ্ধে সমালোচনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন।

তাঁর এই নতুন চিন্ড়াধারা ইরানের অন্যান্য ধর্মীয় নেতা ও শিক্ষার্থীর মাঝে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তা সর্বত্র বিস্ড়ার লাভ করে। এ মতবাদকে নিয়ে ছাত্র-জনতার মধ্যে গড়ে ওঠে এক ধর্মীয় পুনর্জাগরণ যা ১৯৭৯ সালে সংঘটিত বিপ- বকে অনিবার্য করে তোলে। ১৯৬২ সালে রেজাশাহ পাহলভির নিরাপত্তা বাহিনী ইমাম খোমেনীকে তাঁর শাহবিরোধী বক্তব্যের অজুহাতে গ্রেফতার করে এবং দুই বছর পর তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। প্রথমে তুরস্ক, পরে ইরাক এবং সর্বশেষ ফ্রান্সে নির্বাসিত জীবন যাপনের সময় তিনি ইরানে শাহকে উৎখাত করার জন্য তাঁর অনুসারীদের আহ্বান জানান। নির্বাসনের পর ইমাম খোমেনীর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় এবং তাঁকে জনগণ জাতীয় বীর হিসেবে গণ্য করতে শুর" করে। শাহবিরোধী আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয় এবং ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি অন্ড়বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী শাপুর বখতিয়ারকে ক্ষমতায়

রেখে শাহ তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যান। আর এরই ফলে ইসলামি বিপ□ব প্রতিষ্ঠিত ও সাফল্য মন্ডিত হয়। এ সাফল্য ও বিপ□ব প্রতিষ্ঠার পিছনে জাতীয় জাগরণের তাৎপর্য ও ভূমিকা নিহিত রয়েছে। বিপ□ব প্রতিষ্ঠায় জাতীয় জাগরণের এই তাৎপর্য ও ভূমিকা তুলে ধরাই এ গবেষণাকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অত্র গবেষণাকর্মটি প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পাদিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। টীকা, উদ্ধৃতি ও সহায়কপঞ্জি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *কলা অনুষদ পত্রিকা*-এর নিয়মাবলি অনুসরণ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভে বানানরীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত বানানরীতি তথা বাংলা একাডেমি ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত *ব্যবহারিক বাংলা অবিধান*-এর বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় ইরানের ইসলামি বিপ□ব ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত তথ্যনির্ভর গ্রন্থের সংখ্যা অপ্রতুল থাকায় এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যানগত তথ্যসূচক ডাটা সংগ্রহ ও উদ্ধৃতির জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মুখপত্র *নিউজ লেটার*-এর বিভিন্ন সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য *ইসলামি বিপ-ব প্রতিষ্ঠায় ইরানের জাতীয় জাগরণের তাৎপর্য* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি নিচে উলি—খিত তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ড় করা হয়েছে। এর প্রথমে রয়েছে একটি ভূমিকা এবং সবশেষে রয়েছে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি।

ভূমিকা: অভিসন্দর্ভের ভূমিকাপর্বে বিষয় সংশি-ষ্ট ও আনুষঙ্গিক বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বিপ-বের পরিচয় ও ইরানে সংঘটিত ইসলামি বিপ-বের পটভূমি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইসলামি বিপ—ব প্রতিষ্ঠায় ইরানের জাতীয় জাগরণের তাৎপর্য শিরোনামের এ অধ্যায়ে ইরানে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইরানে সংঘটিত ইসলামি বিপ-বের সাফল্য বিশে-ষণ করা হয়েছে।

উপসংহারঃ উপসংহারে উপরিউক্ত অধ্যায়গুলোতে বিধৃত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সারসংক্ষেপ ও ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলামি বিপ- বের পরিচয় ও ইরানে সংঘটিত ইসলামি বিপ- বের পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি বিপ□বের পরিচয়

বিপ-ব হচ্ছে একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিপূর্ণ ও আমূল পরিবর্তন। কোনো দেশের বেলায় একটি সরকার ব্যবস্থাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করে অন্য একটি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। অর্থাৎ কোনো একটি দেশের বিরাজমান শাসনব্যবস্থা বা সমাজব্যবস্থায় দ্রুত ও আমুল পরিবর্তনের নাম হলো বিপ-ব। *Britannica Ready Reference Encyclopedia* গ্রন্থে বিপ-বের সংজ্ঞা তুলে ধরা হয়েছে এইভাবে:

> In politics, foundamental, rapid, and often irreversible change in the established order. Revolution involves a radical achange in government, usually accomplished through violence, that may also result in changes to the economic system, social structure, and cultural values. (Britannica, 2005: 151)

আর ইসলামি বিপ-ব মানে ইসলামি আদর্শ ও অনুশাসনের বিপরীতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত সকল ব্যবস্থাপনা নির্মূল করে সেখানে কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সরকার গঠন। এই পদ্ধতিতেই ইরানে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। এ জন্য অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হয়েছে। দীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছে—যার মূল নেতৃত্বে ছিলেন ইমাম খোমেনী এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন ত্যাগী ও সংগ্রামী আলেম সমাজ ও সর্বস্ড়রের সাধারণ মানুষ। (আলগার, ১৪৩৩ হি.: ১৩)

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, নবী করিম (সা.) প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের এক পর্যায়ে যখন তাগুতি শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তখন নবীদৌহিত্র ইমাম হোসেন (রা.) ইসলামি বিপ-বের নেতৃত্ব দিয়ে তাঁর বিপুল সংখ্যক সংগী-সাথীসহ শাহাদাতবরণ করেছিলেন। তাঁর বিপ-বের মূল প্রেরণা ছিল ইসলামি হুকুমতের পুনরুদ্ধার এবং সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান। হযরত ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ-বে সেই প্রেরণা বহুলাংশে কাজ করেছে।

এটি স্পর্তব্য যে, আশুরা বিপ-বের পর এই পৃথিবী অনেক প্রতিষ্ঠিত সরকার ও ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সংঘটিত বিপ-ব প্রত্যক্ষ করেছে। যেমন ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৭-১৭৯৯), আমেরিকান বিপ-ব (১৭৭২-১৭৭৬ খ্রি.), রুশ বিপ-ব (অক্টোবর ১৯১৭ খ্রি.), চৈনিক বিপ-ব (১৯৪৯ খ্রি.) ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর স্বভাব, প্রকৃতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব কোনোটার সাথেই ইসলামি বিপ-ব ও পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার সাথে তুলনা যায় না। ফরাসি বিপ-ব যা স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা, মানবাধিকার প্রভৃতি শে-াগান নিয়ে এলেও-এর কর্ণধারগণ তা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি। এসকল বিপ্লব পৃথিবীবাসীকে অনেক আশার বাণী শুনিয়েছিল বটে; কিন্তু পরিশেষে মানুষকে হতাশাগ্রস্থই করেছে। (নিউজ লেটার, ২০০৯: ২৬-২৭)

ইসলামি বিপ-ব একটি সামগ্রিক পরিবর্তনেরই নাম। যে সকল মানুষকে নিয়ে বা যে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য বিপ-ব, সে মানুষের নিজের মাঝে যদি বিপ-ব বা পরিবর্তন না আসে তাহলে ইসলামি বিপ-ব হতে পারে না। বিপ-ব বলতে হঠাৎ বা আকস্মিক পরিবর্তনকে বুঝায় না। আকস্মিক পরিবর্তন, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, নৈরাজ্য, সংস্কার, সরকার যন্ত্রের পরিবর্তন বা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন এসবের কোনোটাই ইসলামি বিপ-ব বলে চিহ্নিত বা আখ্যায়িত করা হয়না। ইসলামি বিপ-বের ধারণাটাই এসব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা লাভকেই বিপ-বের জন্য যথেষ্ট মনে করা হয় না। কেননা, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্ব সর্বাবস্থায় আল-াহর এবং বান্দা সর্বাবস্থায় দায়িত্বশীল বা দায়িত্বপ্রাপ্ত। মানুষ আল-াহর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে আল-াহর দেয়া সুযোগ ও ক্ষমতার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করবে এবং আল-াহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালন করবে মাত্র।

রাসুল (সা:) যে মডেল স্থাপন করেছেন ইসলামি বিপ-বের মডেল সেটাই। ইসলামি বিপ-ব তো এ অর্থে যে, এ বিপ-ব মানুষের কাঠামোতে নয়, বরং মন-মনসিকতা, চিন্ড়া-চেতনা, আশা-আকাঙ্খা, রুচি-দৃষ্টিভংগী, পছন্দ-অপছন্দ অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে দেয়।

ইসলামি বিপ-বের অর্থ ইনসাফ, শান্ড়ি, নিরাপত্তা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। অন্য অর্থে আল-াহর রাজত্ব কায়েম করা। ইসলামের মতে আল-াহর দুনিয়ায় আল-াহর রাজ্য কায়েম হওয়ার এ বিপ-ব এমনিতেই আসে না।

অর্থাৎ ইতিহাস এবং বিপ- ব কখনো নিজে নিজেই আসে না। আকস্মিকতা এবং শক্তি প্রয়োগ অনেকে বিপ- বের বৈশিষ্ট্য মনে করে, কিন্তু ইসলামি বিপ- বে তেমন কোনো ধারণাই নেই। ইসলামি বিপ- বের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে এবং এ বিপ—ব বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বিত এক প্রগতিশীল প্রক্রিয়ার নাম। পবিত্র কুরআনে মহান আল—াহ তায়ালা নিজেই বলেছেন,

> আল—াহ ততক্ষণ পর্যন্ড় কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে। (সূরা, রাআদ, আয়াত: ১১)

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে:

> বিভিন্ন জাতিকে পাপাচারের কারণে শাস্ড়ি দানের বিধান এ জন্যই যে, আল- াহ এমন নন যে, যদি কোনো জাতি নিজের অবস্থার পরির্তন না করে তাহলে আল- াহ সে জাতিকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা পরিবর্তন করবেন এবং আল—াহ সবকিছু শোনেন, সব কিছু জানেন। (সুরা আনফাল, আয়াত : ৫৩)।

পরিবর্তন সাধনেরই বর্তমান পরিভাষা বিপ- ব। কাজেই আল- াহই বিপ- বের প্রেরণা দিয়েছেন। কিন্তু এ বিপ- বের ধরন ভিন্ন। সামরিক অভ্যুত্থান বা শ্রেণিসংগ্রামে সহিংসতার জোরে ক্ষমতা দখল নয়। প্রথমে মানুষের নিজের মাঝে বিপ- ব, সেই সাথে চরিত্রে, তারপর 'আমরেবিল মার—ফ ও নাহি আনিল মুনকার, এর পথ ধরে সমাজ ও রাষ্ট্রে আনতে হবে এ বিপ- ব। ইসলামে

বিপ□ব শুধু ভাঙ্গা নয়, বরং ভাঙ্গা ও গড়া একসাথে চলে। মার"ফের প্রচলন আর মুনকারের অপসারণের চূড়ান্ড় রূপ হলো এ বিপ□ব।

মানুষ যে কোনো প্রতিকূলতার ক্ষেত্রে দুটি কর্তব্যের মুখোমুখি হয়। একটি হল আত্মসমর্পণ আর অপরটি হল সংগ্রাম। আর সংগ্রামের দাবি হল তার আশু নিকটবর্তী উপায় উপকরণ নিয়ে সকল কিছুর পরিবর্তন সাধন করা। কোনো মানুষ যদি শেষোক্তোটি পছন্দ করে তাহলে-এর চূড়ান্ড় রূপ লাভ করা ছাড়া তার আর কোনো গন্ড়ব্য থাকে না।

পৃথিবীর ইতিহাস নানা বিপ-বে পরিপূর্ণ। প্রত্যাশা অনুযায়ী মানুষের পরিবর্তন কখনো পৃথিবীর একস্থানে কখনো অন্যস্থানে সংঘটিত হয়েছে। তবে পরিবর্তন যেসব সময় কেবল বিপ-বী পন্থায় সংঘটিত হয়েছে তা নয়; বরং কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে বিবর্তনের মাধ্যমে বা পর্যায়ক্রমে। এখানে বিশেষভাবে বিপ-বী পন্থায় যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে একটি জনগোষ্ঠী যদি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে কেবল মাত্র আল-াহই সে জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন করেন। মূলত মানুষই হচ্ছে ইতিহাসের নির্মাতা এবং পরিবর্তনকারী। আর জনগণের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন। সুতরাং ইসলামি বিপ-ব হচ্ছে একটি ব্যাপক,

বাস্ড়ব ভিত্তিক ও নিরবচ্ছিন্ন গতিশীল পরিবর্তনের নাম। সেই সাথে এ বিপ-ব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, একনায়কত্ব ও স্বৈরাচার বিরোধী। এটি হবে এমন এক সর্বজনীন বিপ-ব যাতে থাকবে আধ্যাত্মিকতা ও ইসলামের সঠিক মেজাজ-প্রকৃতির প্রতিফলন। বিপ-বের নেতৃত্ব, আবেদন, পথ এবং পন্থা হবে সম্পূর্ণরূপে ইসলামের বিধান অনুযায়ী এবং আল-াহর নির্দেশনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে এ বিপ-বের মধ্য দিয়ে।

ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য সংগ্রাম, প্রচেষ্টা প্রয়াস, সাধনা, খিদমাত সবকিছুরই একটি সামগ্রিক এবং ব্যাপক পরিবর্তনের নাম হল ইসলামি বিপ—ব। সত্যিকার ইসলামি বিপ—ব তাই যা আদর্শিক রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। ইসলামেরবিধি-বিধান বাস্ড়বায়নের জন্য জনগণের সার্বিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন আনয়ন হচ্ছেইসলামি বিপ—ব যা গোটা মানবতার বিপ—বরই নামান্ড়র।

অলৌকিকভাবে কোনো বিপ-ব আসতে পারে নাপৃথিবীর ইতিহাস একথাই প্রমাণ করে যে, কোনো দেশ বা সমাজে তেমন কোনো একটি বিপ—ব হঠাৎ করে সম্পন্ন হতে পারে না। ইতিহাসে যে বিপ-বের আলোচনা রয়েছে তাতে দেখা যায় ফরাসি বিপ—ব, র"শ বিপ-ব বা চৈনিক বিপ-ব হঠাৎ করে আসেনি। এসব বিপ-বের পটভূমি রচনার পিছনে আছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সুতরাং প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণের সংযোগ না হওয়া পর্যন্ড় আকস্মিক কোনো বিপ-বের প্রত্যাশা অর্থহীন। ইরানে সংঘটিত বিপ-ব বাইরের জগতের

কাছে আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হলেও ইরানি জনগণের নিকট এটি যে দীর্ঘসংগ্রামের ফসলতাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ বিপ- বকে যারা জানার চেষ্টা করেছেন তাদের স্বীকার করতে হবে যে, অনেক চড়াই-উতরাই অতিক্রম করেই এ বিপ- ব সম্পন্ন হয়েছে। (মজিদী, ১৯৯৬: ৬২)

ইরানের সংঘটিত ইসলামি বিপ—বের পটভূমি

মূলত বিংশশতাব্দীর সূচনাকালে ইরানে ছিল অত্যন্ড় দুর্বল গ্রামীণ সমাজ ভিত্তিক সরকারি ব্যবস্থা। কিন্তু পাহলভি রাজবংশ দেশে কিছু মৌলিক ও কিছু অবাঞ্চিত পরিবর্তন আনে। বিশেষ করে সাভাক* বাহিনীর উপস্থিতি এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি লঙ্ঘন ইত্যাদি ছিল ইরানে বিদেশি হস্ড়ক্ষেপের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ড়। ১৯৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উষ্কানিমূলক সামরিক অভ্যুত্থান ইরানের উপর আরও কিছু দুঃখ-দুদর্শা এসে ভর করে।

অধিকাংশ বিপ- ব সমীক্ষকের মতে, ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা, যৌনাচার, পতিতাবৃত্তি, ইসলামি দিনপঞ্জির স্থলে প্রাক-ইসলামি যুগের দিনপঞ্জি প্রবর্তন এবং সাধারণভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের মোকাবিলায় প্রাক-ইসলামি যুগের প্রাচীন ধর্মীয় মূল্যবোধের দিকে প্রত্যাবর্তন, ইরানে বিপুল সংখ্যক বিদেশি

*(SAVAK) সভাক সাজেমানে এত্তেলায়াত ওয়া আম্নিয়াতে কেশভার- এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ইরানের গুপ্ত পুলিশ, অভ্যন্ড়রীণ নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন- যা মোহাম্মদ রেজাশাহ পাহলভী ১৯৫৬ সালে সিআইএ ও ইসরায়িলের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেছিল। (Iran a country study Edited by Glenn E. Curtis and Evic Hooghund, Library of congress Cataloging-in-Publication. Data, USA, 2008. (PP 276)

নাগরিকদের উপস্থিতি এবং তুলনামূলকভাবে ইরানিদের সমযোগ্যতা সম্পন্ন বিদেশিদেরকে অধিক সুযোগ-সুবিধা দান, ইরানে কর্মরত মার্কিন নাগরিকের অনুকুলে ক্যাপিচুলেশন আইন প্রবর্তন, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং সমাজের সংখ্যালঘু ধনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অবশিষ্টাংশের মধ্যে ব্যবধান ও বৈষম্য তৈরীর কারণে সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং এই ক্ষোভ ইসলামি বিপ-বের পটভূমিকা তৈরি করে। (Islamic Revolution of Iran, 1991 : 17) ইসলামি বিপ-বের শুর“ সূচনার দিকে ইরানে যে পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়:

১। উপনিবেশবাদের অস্ড়িত্ব রক্ষা ও ইসলামি চিন্ড়াধারার মূল্যোৎপাটনের হীন চেষ্টা:

প্রখ্যাত ইসলামি আইনজ্ঞ ও মনীষী মীর্জা মুহাম্মদ হাসান হুগেণনী শিরাজীর লেখনীর কাছে পরাভব মানতে হল তৎকালীন দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তি বৃটিশ রাজশক্তির। মীর্জা শিরাজীর এক ধর্মীয় ঘোষণায় বলা হয় "রাহমানুর রাহীম আল-াহর নামে বলছি, এখন থেকে তামাক সেবন ও ধূমপান ইসলামের বির“দ্ধে যুদ্ধের শামিল।" (Muhajeri, 1983 : 1-3) এ ঘোষণার পর ইরানের রাজতান্ত্রিক সরকারের কর্মচারীরা স্বচক্ষে দেখল, ইরানি জনতা মীর্জা শিরাজীর ঘোষণা পাওয়ার সাথে সাথে হুক্কা, তামাক প্রভৃতি ধূমপানের সামগ্রী ভেঙ্গে ফেলল। এমনকি তামাক সম্পর্কিত চুক্তির সাথে সংশি-ষ্ট শাহ নাসের উদদীনকে রাজ প্রাসাদে তার স্ত্রী পরিচারিকা ও ভৃত্যরা তাকে একঘরে করে

রাখল। এ ঘটনা বৃটিশদের জন্য কেবল ব্যর্থতাই ছিলনা, তা ছিল তাদের জন্য শিক্ষণীয়ও বটে। তারা উপলব্ধি করল যে, ইরানে ইসলামই তাদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী এবং জনগণ রাজদরবারে নয়, বরং ধর্মীয় নেতাদের ঘোষণার মধ্যেই খুঁজে পেত ইসলামের মর্মবাণী।

ইসলাম এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে বৃটিশদের আরেকটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে 'সংবিধান আন্দোলন'/ সাংবিধানিক বিপ□ব*। সংবিধান আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও উদ্যোক্তা শেখ ফজলুল-াহ নুরী স্বীয় বিচক্ষণতার মাধ্যমে বুঝতে পারলেন যে, এ আন্দোলন হুমকির সম্মুখীন। বৃটিশরা পাশ্চাত্য চিন্ড়াধারার ভিত্তিতে সংবিধান খ"িত করতে চেয়েছিল। তারা কিছু ইসলামি রং মাখিয়ে এ সংবিধানকে ইসলামি সংবিধান হিসেবে অভিহিত করে জনগণকে প্রভাবিত করতে মতলব এঁটেছিল। (মজিদী, ১৯৯৬: ৯১)

তাই নুরী এ ধরনের সংবিধানের ঘোর বিরোধীতা করেন এবং পাশ্চাত্য নয়, কোরআনের ভিত্তিতে প্রণীত সংবিধান বিশিষ্ট একটি ইসলামি সরকার গঠনের আহবান জানান। প্রকৃত পক্ষে তিনি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ঐ

---

* ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ইরানে শাহ ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি বিধিবিধানের ঊর্ধ্বে থেকে দেশ ও জনগণের মালিক হতেন। এর বিপরীতে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এ দেশের শাসনকার্য কতিপয় বিধিবিধানের আওতায় নিয়ে আসা এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লামেন্ট গঠনের নিমিত্ত এক ধরনের বিপ- ব সংঘটিত হয় যার নাম দেয়া হয় ইনকিলাবে মাশর"তিয়াত। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এই ইনকিলাবে মাশর"তিয়াত তথা সাংবিধানিক বিপ–বের মাধ্যমে ইরানে সর্ব প্রথম স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থার আন্দোল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বিপ–বের প্রধান লক্ষ্য ছিলো শাহের ক্ষমতা হ্রাস এবং গণভিত্তিক ও সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সাংবিধানিক বিপ–ব যখন সাফল্যমন্ডিত হয় তখন ইরানে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বহুলাংশে রহিত হয়। (নিউজ লেটার, ২০১৮, ১৯)

সংবিধানের বিরোধিতা করলেও বৃটিশরা অজুহাত তুলল যে, তিনি সংবিধানের বিরোধী এবং এ অজুহাতেই সংবিধানের ভুয়া প্রবক্তরা শেখ ফজলুল-াহ নুরীকে ফাঁসিতে ঝোলাল। নিজেরাই প্রণয়ন করল এক সংবিধান, যা কার্যত: পাহলভী রাজবংশের কৃষ্ণ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করল। এ সংবিধান, প্রণেতারাই বিভিন্ন মন্ত্রীত্বের গদি দখল করল। অবশেষে বৃটিশরা এ আন্দোলন, বিপথে চালিত করতে এবং ইরানে নিজেদের ইপ্সিত শাসন ব্যবস্থা কায়েম সফল হল। কিন্তু তারা স্পষ্টভাবেই বুঝল যে, ইরানে তারা ইসলাম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মুখোমুখী হয়েছে, লিপ্ত হয়েছে সংঘাতে।

১৯২০ সাল নাগাদ ইরাকে ইসলামি আন্দোলন ইসলাম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে বৃটিশদের আরেকটি তিক্ত অভিজ্ঞতা। ঐ আন্দোলনের ফলেই ইরাক থেকে বৃটিশ রাজশক্তিকে চলে যেতে হয়েছে। মীর্জা মুহাম্মদ তাকি, শিরাজী, আয়াতুল-াহ সৈয়দ আবুল কাশিম কাশানী ও তাঁর পিতা আয়াতুল-াহ সৈয়দ মুস্ড়ফা কাশানিসহ অন্যান্য ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে এ সংগ্রামে বৃটিশরা আরেকবার ইসলামের ক্ষমতা ও জনগণের ওপর ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাবের ব্যপকতা উপলব্ধি করল।

১৯৫২-১৯৫৩ সালে তেল শিল্প জাতীয়করণের সময়ও বৃটিশরা দেখল যে, তারা আবার ঐ একই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে- যারা ইরাকে বৃটিশদের পরাজিত করেছেন। সংবিধান আন্দোলন ও শেখ ফজলুল–াহ নুরীর বির"দ্ধে বৃটিশরা যেমন করেছিল, এবারেও উপনিবেশবাদীরা সেভাবেই

এ আন্দোলনকে মূল পথ থেকে সরিয়ে ফেলে। ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে তারা আমেরিকার নেতৃত্বে নয়া উপনিবেশবাদের পথ প্রশস্ড় করে। উপনিবেশবাদীরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী জনগণের ওপর পাহলভি রাজবংশের শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিল এবং তা টিকেয়ে রাখার সিদ্ধান্ড় নিল। তারা মীর্জা শিরাজী, শেখ ফজলুল-াহ নুরী ও আয়াতুল-াহ কাশানির মত সচেতন ও প্রকৃত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে দেখে অবাক হয়ে গেল। এ কারণে, তামাক সম্পর্কিত ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে উপনিবেশবাদীরা এসব সংগ্রামের প্রধান মূল ধ্বংসের চেষ্টা গুর"ত্ব সহকারে শুর" করল। তারা উপলব্ধি করল যে, সারাসরি ইসলামের সাথে সংঘাতে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই তারা এই মর্মে সাব্যস্ড় করল যে, এমন একটি পন্থা উদ্ভাবন করা উচিত- যে পন্থায় ইসলামের বিরোধিতা করতে হয় না, বরং ইসলামের অভিভাবকের ভূমিকায় অভিনয় করা যায় এবং একইসাথে ইসলামি চিন্ড়াধারা উৎপাটন করা সম্ভব হয়। (মজিদী, ১৯৯৬: ৯২-৯৪)

০২। ইসলাম উৎখাতে পাহলভি রাজবংশের ক্ষমতা গ্রহণ:

ইরানে বৃটিশরা ইসলাম উৎখাতের দায়িত্ব দেয় রেজা খানকে। এছাড়া, আমেরিকানরা রেজা খানের কাজ-কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে এ কাজের জন্য পাহলভি রাজবংশকে আবার ক্ষমতাসীন করার সিদ্ধান্ড় নেয়। আর রাজবংশ চালাতে থাকে ইসলাম নির্মূলের কাজ। এ ধূর্তামির কাজ পাহলভি রাজবংশ এত দক্ষতার সাথে চালাত যে, মধ্যপ্রাচ্যে উপনিবেশবাদের চর হিসেবে পাহলভি শাসক

গোষ্ঠীকে বেছে নেয় এবং পারস্য উপসাগর ও ওমান সাগর এলাকা নিরূপদ্রব রাখার দায়িত্ব দেয় মুহাম্মদ রেজা পাহলভির ওপর। তাকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের পাহারাদার হিসেবে অভিহিত করা হত।

নয়া উপনিবেশবাদীরা সকল মুসলিম দেশে ইসলামি সংস্কৃতি নির্মূল করা এবং ধর্মীয় হঠকারিতার দিকে মুসলমানদের ঠেলে দেয়ার জন্য সকল প্রচেষ্টা চালায়। রেজা খান পাহলভি ইসলাম ধ্বংসের এ পটভূমি তৈরি করে। (মজিদী, ১৯৯৬: ১৩০)

রেজা খান পশ্চিমা সংস্কৃতি লালন পালন ও বিকাশ সাধন, ইসলামি চিন্ড়াধারা নিরুৎসাহিতকরণ এবং নারীদের বিবস্ত্রকরণ ও একই ধরনের পোশাক প্রবর্তনের কাজ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এগিয়ে নেয় ও জোরেসোরে। শাহ ইরান থেকে ইসলাম বিতাড়নের ভিত্তিপ্রস্ড়র স্থাপন করে। ইরানে পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করার ক্ষেত্রে শাহ নাসের উদ্দীন কিছু ব্যবস্থা নিলেও, রেজা খান এ কাজটি যতটা গুরুত্ব ও ধৈর্যের সাথে চালিয়েছিল, ততটা পারেনি।

ধর্ম-বিরোধী কাজ-কর্মের জন্য রেজা খানের পক্ষে বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব ছিলনা। নয়া ঔপনিবেশিক প্রভুরা রেজা খানের পাশ্চাত্য শিক্ষিত পুত্র মুহাম্মদ রেজাকে ক্ষমতায় বসাল। ঔপনিবেশবাদীদের ইচ্ছা বাস্ড়বায়নের কাজ অব্যাহত রাখার মত করে তাকে গড়ে তোলা হয়েছিল। তারা মুহাম্মদ রেজাকে "ইসলাম হঠাও"-এর দায়িত্ব দেয়। সে ছিল উপনিবেশবাদীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার

কাছে নতজানু, দুর্বলচেতা ব্যক্তিত্ব। তবে শাসনকালের একটি উলে- খযোগ্য সময় যাবৎ নিজের দুর্বল অবস্থান হেতু সে প্রভুদের ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। ১৩৩২-এর ২৮শে খোরদাদে (১৯৫৩) অভ্যুত্থানের পরে মুহাম্মদ রেজা পাহলভি ইরানে ফিরে আসে, আমেরিকার সাহায্যে সংহত করে ক্ষমতা। এরপরই "ইসলাম হটাও"-এর কাজ নতুন গতি পায়। ১৯৬১ সাল পর্যন্ড় সে নিজের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। ঐ সময়ে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে শুর" হয় আন্দোলন। এ আন্দোলন ছিলমুহাম্মদ রেজার কাছে এক বিরাট বাধা। এ আন্দোলন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রভাবিত করে। জনগণের উপর মরহুম আয়াতুল—াহ বুর"জারদির প্রভাব ছিলব্যাপক। এ প্রভাব এতই ব্যাপক ছিল যে, শাহ কখনোই ইসলামের বির"দ্ধে প্রকাশ্যে লড়াই চালাতে সাহস করেনি। সে নিজেই স্বরচিত বই "শ্বেত বিপ- ব"*-এর ভূমিকায় এ কথা স্বীকার করেছে। (Muhajeri, 1983 : 3-6)

ভূমি সংস্কারের নামে ১৯৫৯ সালে শাহ যে বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ করতে যাচ্ছিল সেটা জনগণের উপর ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাবেই ব্যর্থ হয়। এ প্রভাবই শাহের পরিকল্পনায় বাধা দেয়। ১৯৬১ সালে আয়াতুল—াহ বর"জারদির ইন্ড়েকালের পরে রেজাশাহ নাজাফে আয়াতুল- াহ সৈয়দ মুহসীনের কাছে এই মর্মে শোকবাণী পাঠায়। যে, বর্তমানে ধর্মীয় নেতৃত্বের

*১৯৬৩ সালে রেজাশাহ পাহ্লভী 'শ্বেত বিপ- ব' নামে গণ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বস্তুত এ পরিকল্পনাটি ইরানি জনগণ ও দেশের অর্থনীতির জন্য ছিল অত্যন্ড় ক্ষতিকর। এ কারণে ধর্মীয় নগরী কোম থেকে এই পরিকল্পনার বিরোধিতার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে সময় এ ব্যাপারে গণভোটের আয়োজন করা হয়। কিন্তু ইরানের অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের গণভোট বয়কট করে। (Islamic Revolution of Iran, 1991 : 58)

কেন্দ্রস্থল নাজাফে ইরানের বাইরের। জনগণের উচিত নয় ইরানের ধর্মীয় নেতৃত্বকে মেনে চলা। তার এ রাজনৈতিক চালবাজিই প্রমাণ করে যে, নিজেদের অশুভ স্বার্থ চরিতার্থ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাব অবসানে উপনিবেশিক প্রভুরা কতইনা তৎপর ছিল।

০৩। ৫ জুনের রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানঃ

ইরানি মুসলিম জনগণেরজনতার মধ্যে এক নয়া আন্দোলনের সূচনাস্থল ছিল ১৯৬৩-এর ৫ জুনের গণঅভ্যুত্থান। ১৯৬৩ সালের ৫ জুন সকালে ইমাম খোমেনীর গ্রেফতার ও তেহরানে তাঁকে কারান্তরীণ করার পরে ইরানের বিশেষত তেহরান, কোম, মাশাহাদ, শিরাজ, ইস্পাহান ও তাব্রিজের মত বড় বড় নগরীর জনগণ নিজেদের নেতার সমর্থনে ও শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। শাহের সরকার সামরিক আইন জারি করে নির্মমভাবে হত্যা করে ১৫ হাজার মানুষ এবং এভাবেই সাময়িককালের জন্য নিভিয়ে দেয় প্রতিবাদের এ শিখা। ঐ দিনে জ্বলে ওঠা বিদ্রোহের আগুণ নিপীড়ন-নির্যাতনের ভস্মতলে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে এবং অবশেষে ১৫ বছর পরে অত্যাচার অনাচার-অবিচারের শাহী বালাখানা পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।

ইরানের যে মুসলিম জনগণ একটি ইসলামি সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য, শতাব্দীর পর শতাব্দী যে সংগ্রাম করেছেন সে আদর্শ, চেতনা ও

অনুপ্রেরণাই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে ৫ জুনের গণ-অভ্যুত্থানে। এ গণ-অভ্যুদয় ছিল ইমাম খোমেনীর ইসলামি কানুন কায়েমের আহবানের সাড়া দিয়ে উত্থিত নব বংশধরদের কাছে অতীত অভিজ্ঞতামালা হস্ড়ান্ড়রে সেতু বন্ধন। (Islamic Revolution of Iran, 1991 : 92)

এই ৫ই জুনের অভ্যুত্থানই ইরানে নওমুসিলম বংশধরদের ধর্ম-রাজনৈতিক সংগঠনের যোগ দিতে উৎসাহিত করে এবং এ সময় থেকেই রাজতান্ত্রিক শাসনক্ষমতার উৎখাতের লক্ষ্যে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এসব দলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা ইসলামি ও ইসলামের প্রতি সর্বাপেক্ষা অনুগত হল "ইউনাইটেড ইসলামিক গ্র"প"। এ গ্র"পটি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলএবং ইমাম খোমেনীকে প্রকৃত ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করত। (Muhajeri, 1983 : 8-9)

০৪। ইসলামকে দরবারিকরণঃ

নয়া উপনিবেশবাদীরা পুরোপুরি সচেতন ছিল যে, মুসলিম দেশসমূহ বিশেষত ইরানে খোলাখোলিভাবে ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করাটা মারাত্মক ভুল হবে। যদি তাই করা হয়, তবে ফলাফল হবে সেটাই, যেটাকে তারা দুর্বল করতে চেয়েছে। ইরান তথা মুসলিম দেশসমূহের জনসাধারণ গভীরভাবে ধার্মিক। তাই নয়া উপনিবেশবাদীরা কখনোই ইসলামকে সরাসরি অস্বীকার বা সমালোচনা করার চেষ্টা করনি, বরং তারা ইসলামকে অন্য কিছুতে রূপান্ড়রিত

করার চেষ্টা করে এ ইসলামের সাথে তাল মিলিয়ে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদীদের জন্য চারটি অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ সুবিধা ছিল। তাদের ইস্পিত এ ধরনের ইসলামকে 'দরবারের ইসলাম' হিসেবে আখ্যা দেয়া যেতে পারে।

প্রথমত: তাদের এ ধরনের ইসলাম জনগণের আদর্শগত নীতিমালা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা না করেই ইসলামি সংস্কৃতির বদলে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি কায়েমের পথ প্রশস্ড় করবে এবং এভাবেই তারা কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়ে মুসলিম দেশসমূহের সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারবে।

দ্বিতীয়ত: এই বিকৃত ধরনের ইসলামের প্রচার করে তারা মুসলিম দেশগুলোতে নিজেদের পদলেহী শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারবে।

তৃতীয়ত: নয়া উপনিবেশবাদী সরকারসমূহ ক্ষমতায় থাকলে ঔসব সরকার নিপীড়িতদের হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। তারা জানত যে, উপনিবেশবাদের বির"দ্ধে সংগ্রামে মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে যদি জেগে ওঠে, তবে তা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর নিপীড়িত জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্দীপিত করবে। এটা বিশ্বের সকল নিপীড়কের জন্যই গুর"ত্বর হুমকি।

চতুর্থত: প্রকৃত ইসলামের বদলে "দরবারের ইসলামকে" সামনে তুলে ধরার সুবিধা হল, যেসব লোকেরা একটি আদর্শ অন্বেষণ করছেন, তারা

"দরবারের ইসলামের" মধ্যে সেধরনের আদর্শ খুঁজে পাবেন না এবং অবশেষে এ ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন তারা মনে করবেন যে, কোনো ধর্মই মানবজাতির জন্য এ বিশ্বজগতের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বিপরীতে, প্রকৃত ইসলামের সাথে পরিচিত হলে একজন ব্যক্তি বিশ্বকে অনুধাবন করতে পারে, বিমূর্ত থেকে পারে নিজেকে মুক্ত করতে এবং নিপীড়ন, অবিচার, অসাম্য ও অত্যাচারের বির"দ্ধে নিজেকে এক প্রতিরোধী শক্তিতে রূপান্ড়রিত করতে পারে। (হোসেন, ২০১৩ : ৩৪১)

'দরবারের ইসলাম'-কে তুলে ধরার মাধ্যমেই অর্জিত অন্যতম সুবিধা হচ্ছে এসব ব্যক্তিবর্গের বিচ্যুতি, এসব ব্যক্তিই উপনিবেশবাদের বির"দ্ধে লড়াইতে সম্ভাব্য কর্মী হতে পারত। বিচ্যুত আদর্শসমূহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি অথবা এক নয়া আদর্শ সৃষ্টিরপ্রাথমিক কাজের প্রস্তুতিও "দরবারের ইসলামের" অন্যতম সুবিধা। রাজতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী এ কাজে এতই গুর"ত্ব দিত যে, অর্থ যোগানোর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হত। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অসংখ্য সংগঠনও স্থাপন করা হয়েছিল। অইসলামিকরণের ক্ষেত্রে এ চক্রান্ড়, একটি অতীব গুর"ত্বপূর্ণ উপাদান একথা বিবেচনা করেই পাহলভি শাসকগোষ্ঠী সিংহাসণ টিকিয়ে রাখার জন্য এ কাজে বিশেষ মনযোগ দিত। এমনকি দেশের বাইরেও বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করে বিষয়টি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। এ কাজে ব্যবহৃত শাসকগোষ্ঠীর প্রধান অনুচর ছিলতথাকথিত পশ্চিমা ইসলাম তত্ত্ববিদ ও পশ্চিমা মতানুসারী

বুদ্ধিজীবীরা। এরা পরস্পরের সাথে মিলে ইরানে জনগণকে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালায়। (Muhajeri, 1983: 10)

০৫। সরকারি সাম্যবাদনীতিঃ

ইসলাম নির্মূল করার জন্য এক ধরনের চক্রান্ড়মূলক নীতি আঁটা হয়েছিল। সমাজ থেকে ইসলাম দূর হলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের কথা ও চিন্ড়া করতে ব্যর্থ হয়নি এ চক্রান্ড়ের হোতারা। তারা ভালভাবেই জানত যে, পর্যাপ্ত জ্ঞানহীন জনসাধারণের জন্য রাজকীয় ইসলাম একটি উপযুক্ত বিকল্প হতে পারে। তাই তারা জনগণকে ধোঁকা দিতে সরকারি সাম্যবাদসহ অন্যান্য নীতি ব্যবস্থাও গ্রহণ করে।

পাহলভি শাসকগোষ্ঠীর হয় দরবারের সাহায্যে নয় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন শক্তিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন ও শিল্প সংগঠনকে একটি প্রগতিশীল রংয়ের প্রলেপ দেয়া হয়। বুদ্ধিজীবি সংগঠনগুলোর প্রতি ইরানি সমাজের একটি শ্রেণির আকর্ষণ এবং একইসাথে সরকার কর্তৃক সহ্য করা এসব সংগঠনের সমালোচনার ব্যাপারটি ছিল বৃদ্ধিবৃত্তিক সমাজের সন্তুষ্টির জন্যপাহলভি শাসকগোষ্ঠীর কাছে এক বিরাট সাহায্য। (হোসেন, ২০১৩: ৩৪৫)

এসব লোক নিজেদেরকে কবিতা, ছবি আঁকা, ও নাট্যাভিনয়ে ব্যস্ড় রাখত মাঝে মাঝে এসব কাজ-কর্মের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর সামান্য সমালোচনা করত। কিন্তু এসব সমালোচনা ক্রমান্বয়ে অভিজাততন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদের ফাঁদে আটকে গেল। এ ধরনের সমালোচনা কখনো সচেতনভাবে আবার কখনো

অচেতনতভাবে করা হতো। প্রকৃতপক্ষে, উপনিবেশীকরণ শাসকগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য ছিলএসব লোককে এমন কিছুতে নিয়োজিত রাখা- যা সরকারের নীতির সাথে সংঘাতে অবতীর্ণ না হয়। এভাবেই সমালোচনা সত্ত্বেও এগুলো "সেফটি ভাল্ব" বা নিরাপদ নির্গমন দ্বার হিসেবে কাজ করত। শাকসগোষ্ঠী যেহেতু জানত যে এ সকল সমালোচকশক্তি শেষাবধি অভিজাততন্ত্রের পাঁকেই নিমগ্ন হবে এবং একদিন এরাই উপনিবেশবাদীদের অপরাধের পক্ষে ছাফাই গাইবে। এ কারণেই এসব গোষ্ঠীকে "ইরান-আমেরিকা" সমিতির ন্যায় সমিতি ও সংঘকে নকল সমালোচনা মূলক কবিতা আবৃত্তি করতে দেয়া হত। এদের দ্বারা নিয়মিত নাট্যানুষ্ঠানগুলো পাহলভি শাসকগোষ্ঠীর টেলিভিশনে দেখানো হতো এবং চিত্রাংকনসমূহ পাঠানো হত আন্ড়র্জাতিক প্রতিযোগিতাসমূহে যাতে সেখানে এসব চিত্রাংকন সাধারণ পুর"স্কার লাভ করতে পারে। ইসলামি মার্কসবাদী আন্দোলন গঠিত হয়েছে বলে ধারণা দেয়ার জন্য এসব কাজ-কর্মের অনেকগুলোর গায়েই লাগানো হয়েছিল সাম্যবাদের রং। এ ধরনের সাম্যবাদ রাজতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। অথচ সাম্যবাদের সাথে রাজতন্ত্রের সংঘাত হবে বলেই মনে করা হয়। কিন্তু এটি ছিল আরেকটা বানোয়াট ব্যাপার যা "সরকারি সাম্যবাদ" নামে সমালোচিত ছিল। (হোসেন, ২০১৩: ৩৪৭)

০৬। মিথ্যা জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাঃ

জাতীয়তাবাদ হচ্ছে আরেকটি মাধ্যম- যা উপানিবেশবাদীরা ইসলামি করণের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের জন্য চালু করেছে। একটি মুসলমান জাতির মধ্যে বর্ণগত অহংবোধ জাগানোর মাধ্যমে জনগণের মনযোগ ইসলাম থেকে সরিয়ে দেয়া সম্ভব হতে পারে। জাতীয়তাবাদের চেতনা প্রচারের মাধ্যমে উপনিবেশবাদীরা এই ধরনের আরেকটি সুবিধাও পেয়েছিল। যেসব জায়গায় তারা ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, সেসব স্থানে তারা ইসলামের বদলে জাতীয়তাবাদের বন্দনা শুর" করে। ইরানে ইসলাম বিতাড়নের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিভিন্ন রূপে শুর" করা হয় এবং তা অব্যাহতভাবে চলতে ছিল। ইরানি জাতীয় সংস্কৃতি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পাহলভি শাসকগোষ্ঠী ভ্রান্ড় জাতীয়তাবাদের চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষক লেখকও শিল্পীরা ছিল এর উদ্যোক্তা। পাহলভি শাসনের সমগ্র পর্যায় সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী ব্যক্তিত্বরা ফারসি হরফের স্থলে ল্যাটিন হরফ চালু করার অব্যাহত চেষ্টা চালায়। এ কাজটিকে ইরানি জাতিসত্তার ওপর এক ধ্বংসাত্মক আঘাত এবং ইসলামি সংস্কৃতি, ফারসি বর্ণমালায় লিখন পদ্ধতি, কবিতা গল্প ও গদ্য সাহিত্যের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে বিবেচনা করা হয়। ইরানি জাতীয়তাবাদের ওপর এ ধরনের আঘাত হানার পাশাপাশি শাসকগোষ্ঠী আরব মুসলমানদের বির"দ্ধে আরো ব্যাপক ও তীব্রভাবে প্রচার চালায়। ইরানি জনগণকে ইরানে ইসলামের আগমন এবং আরব মুসলমান ও ইরানিদের মধ্যে সংঘটিত অতীত

যুদ্ধসমূহের কথা মনে করিয়ে দেয়া হয়। ইসলাম ও আরবদের স্থুল ভাবমূর্তি তুলে ধরার লক্ষ্যে এটি করা হয়। এর কারণ, ইরানি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা উস্কে দিয়ে এবং আরবদের সম্পর্কে ইরানিদের মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলে ইরানি ও আরবদের মধ্যে ইসলামি ঐক্য ধ্বংস করা সম্ভব এবং ইরানে ইসলামের বদলে জাতীয়তাবাদকে স্থলাভিষিক্ত করা যায় বলে শাসকগোষ্ঠী মনে করেছিল। এটা গুর"ত্বপূর্ণ ব্যাপার এই কারণে যে, পাহলভি শাসকগোষ্ঠীর প্রচারিত জাতীয়তাবাদ প্রকৃত ইরানি জাতিয়াতাবাদ ছিলনা, এটা ছিল এমনই এক জাতিয়তাবাদ যা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত এবং সে অনুসারে সংশোধিত। (Muhajeri, 1983: 14-16)

০৭। পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদঃ

উপনিবেশীকরণের ন্যায় উদারতাবাদকেও একইভাবে মতলাব হাসিনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমারা ব্যবহার করে। এ কারণেই পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদ ও প্রকৃত উদারতাবাদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। উপনিবেশীকরণ শব্দটি দিয়ে উন্নয়ন ও সভ্যতা বোঝায় এবং চমৎকার নামের আড়ালে উপনিবেশবাদীরাও অঞ্চলের পর অঞ্চল লুণ্ঠন করছে অনুরূপভাবে উদার নৈতিকতাবাদ শব্দটি দিয়ে বোঝায় যে কোনো মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্তি। মুক্তি অন্বেষী ব্যক্তির ক্ষেত্রে উদারনৈতিক শব্দটি প্রযোজ্য। কিন্তু শব্দটি উপনিবেশবাদীদের কব্জায় আসার পর থেকে নয়া উপনিবেশীকরণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ফলে এ শব্দটির এখন সকল মানবীয় ও ঐশ্বরিক দায়িত্ব

থেকে মুক্তি এবং নয়া উপনীবেশবাদীদের আরোপিত বিধি নিষেধ ও সীমাবদ্ধতার কাছে আত্মসমর্পণ বোঝায়। (হোসেন, ২০১৩: ৩৪৭)

পাশ্চাত্য জগতে এবং পাশ্চাত্য প্রভাবিত তৃতীয় বিশ্বের উদারতাবাদ বলতে আল-াহর আদেশ থেকে স্বাধীনতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার দাসত্বকে বোঝানো হয়। বিজ্ঞানের নামে পশ্চিমা উদারনৈতিক ব্যক্তি ঐশ্বরিক প্রকৃতি থেকে পালায়ন ও পাশবিক গুণাবলিতে আশ্রয় গ্রহণকে বোঝে। পশ্চিমা উদারতাবাদে বিভিন্ন পাপ এবং মিথ্যা কাঠামোতে চাপিয়ে দেয়া হয় এবং একেই দেখানো হয় মহান মানবীয় মূল্যবোধ হিসেবে। স্বাধীনতা শব্দটি এই মিথ্যা কাঠামোকে যুক্তযুক্ত প্রমাণ করে। ফলেপশ্চিমা উদারতাবাদ এমনই এক কসাইখানা-যেখানে মুনাফাখোরি, লম্পট ও খোদায় অবিশ্বাসীদের শয়তানী প্রকৃতির ইচ্ছার বেদীতে স্বাধীনতাকে বলী দেয়া হয়। অনৈসলামিকীকরণের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে উপনিবেশবাদীরা এ ধরনের উদারতাবাদকেই গ্রহণ করে। মানুষের চিন্ড়া-চেতনা থেকে আল-াহর কথা যখন লুপ্ত হয় তখনই আবির্ভূত হয় পশ্চিমা উদারতাবাদ। এ চিন্ড়া মানুষকে বৈষয়িক জগতের সাথে বেঁদে ফেলে, আল–াহ থেকে দূরে টেনে নেয়। পশ্চিমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে এক জন উদারনৈতিক ব্যক্তি হচ্ছেন সেই লোক-যিনি নিজেকে আত্মত্যাগ, শাহাদাৎ বরণের আকাঙ্খা, খোদাভক্তি, ক্ষমাশীলতা, শুদ্ধতা, জ্ঞান, নৈতিকতা, সাহসিকতাসহ আল–াহর ইবাদাত সংশি-ষ্ট চেতনা গুণাবলি থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। তিনি হচেছন এমনই একজন যিনি ধন-সম্পদ, আয়াশ, সামাজিক অবস্থান, বাহ্যিক ব্যবহার,

সীমাহীন যৌণ সংশ্রব, বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং দেহ ও পার্থিক জগতের সাথে সংশি- ষ্ট সকল কিছুতেই আগ্রহী। (Muhajeri, 1983: 16)

আল–াহ ও তার ঐশী নির্দেশাবলির প্রতি ভক্ত মানুষকে উপরোলি–খিত বৈশিষ্ট্যমি"ত পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদে রূপান্ড়র করার কাজে উপনিবেশবদীরা ব্যাপক চেষ্টা চালায়। স্পেনে ফরাসিদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে উপনিবেশবাদীরা উপলব্ধি করে যে, উচ্ছৃংখল যৌন সম্পর্ক, জুয়া ও মদে আসক্তি এবং ভোগবিলাসে পার্কে নিমগ্ন করাই হচ্ছে উপযুক্ত পন্থা- যা দিয়ে মুসলমানদের অন্যত্র ব্যস্ড় রাখা যায়। খোদাকে ভুলে যাওয়া ও দুর্নীতিবাজ হয়ে যাওয়া মুসলমানদের যে কোনো শক্তি সহজেই আয়ত্তে আনতে পারে। স্পেনে ও মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয়রা মুসলামনদের এভাবেই নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও ইহুদিরা ফরাসিদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রত্যেক মুসলিম দেশের মর্মমূলে ক্যান্সার আক্রান্ড় কোষের মত শিকড় বিছিয়ে দিয়েছে। অনুরূপভাবে ইরানেও পাহলভি রাজবংশের পরিকল্পনা ছিলমানুষকে আল- াহর ইবাদত থেকে দূরে টেনে আনা। পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদে আসক্ত করে তারা এটা করতে চেয়েছিল। কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়ে নিজেদের অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই উপনিবেশবাদীরা এটা পরিকল্পনা করেছিল। (Muhajeri, 1983: 17-20)

০৮। সাংস্কৃতিক পরনির্ভরশীলতা:

ইরানের জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশ মুসলমান। তাই এটা স্বাভাবিক যে, ইরানের সামাজিক ব্যবস্থা একটি ইসলামি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা ইসলামি সংস্কৃতি ও শিক্ষা থেকে উৎসারিত। এ সত্ত্বেও পাহলভি শাসকগোষ্ঠী ইসলামি সংস্কৃতি ধ্বংস এবং পশ্চিমা মূল্যবোধের ভিত্তিতে পশ্চিমা সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বিপুল প্রচেষ্টা চালায়। এ নীতি হচ্ছে উপনিবেশগুলোর পুরোপুরি দাসত্ব মূলক নীতি। পশ্চিমা ব্যবস্থার মানুষ একজন ভোক্তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সে এমনই এক ভোক্তা যে কেবল আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রীই ভোগ করেনা, বরং চিন্ড়া-চেতনা ও ভোগ করে। এ মূল্য ব্যবস্থায় নারী পণ্য ব্যতীত, পুর"ষের লিপ্সা চরিতার্থের ও মজ্জার উপকরণ ভিন্ন কিছু নয়। পশ্চিমা জগতকে নকল করে পাহলভি শাসকগোষ্ঠীর নেতারা ইরানি মুসলিম নারীকে নামিয়ে আনল এমনই এক স্ড়রে, যেখানে নারীর ভূমিকা হল অভিনেত্রীর। আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রী ও ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার বিজ্ঞাপন ও প্রদর্শনেই তাকে নিয়োগ করা হতো এবং এটাই হল তার কাজ ও সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পেশা। আপাতঃদৃষ্টিতে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী অপমানজনক মনে না হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা ছিলমুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল নারীর প্রতি প্রচ" অপমান। (হোসেন, ২০১৩: ৩৪৫)

১৯৭৭ সালের গ্রীষ্মে ফারাহ পাহলভির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিরাজ চলচ্চিত্র উৎসব নামের আড়ালে ঐ নগরীর মুসলমান বাসিন্দাদের বিস্ময়াভূত

দৃষ্টির সামনে যৌন ক্রিয়াকলাপ চালানো হয়। এ ধরনের প্রদর্শনী কেবল মানুষের মানবিক সত্ত্বার মহত্ত্বের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা নয়, এটা সৃজনী ক্ষমতার অপচয়ও বটে। ইরানের ইসলামি সমাজের বির"দ্ধে উপনিবেশবাদীরা যেসব অপরাধ করেছিলএটা তার অংশ মাত্র। মানব বিরোধী ও পাশ্চাত্যের উপনিবেশিক মূল্যবোধ তুলে ধরার মাধ্যমে সংস্কৃতির বিকৃতি সাধন, বিশেষত সমাজে নারীর অব-মূল্যায়ন ঘটানো ছাড়া শিল্প ও সংস্কৃতির তথাকথিত দক্ষতর কেন্দ্রগুলো বেশ্যাবৃত্তি ও যৌন বিকৃতির কেন্দ্র ভিন্ন কিছু ছিলনা। সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, টেলিভিশন এমনকি সংবাদপত্র পুরোমাত্রায় ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি তুলে ধরত, আর এ বিশ্বাস ঘাতকতার কাজে ব্যবহার করা হতো বিপুল অর্থ। ডিগ্রির ইরানি যুব সম্প্রদায়ের জ্ঞান অর্জন যাতে কখনোই সমাজের কল্যাণে না করে, সে ব্যবস্থাই করা হয়েছিল।

পশ্চিমা-প্রবণতা ইরানি সমাজকে সংক্রামক রোগের মতো আক্রান্ড় করেছিল। পশ্চিমা জগতের নকল করা পোশাক পরিধান, রূপসজ্জা, হাঁটা, খাওয়া, সভা করা, নাচা, বিলাস করা, এমনকি শিশুদের নাম, সরণী, সড়ক ও দোকানের নাম রাখার ব্যাপারটি ইরানি জনগণের জন্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। রাজদরবারের ও অভিজাত পরিবারগুলোর মেয়েরা পোশাক তৈরি, কেশ বিন্যাস বা রূপসজ্জার জন্য ইউরোপ যেত। ইরানের বিপুল সংখ্যক জনগণ যখন জীবনের অপরিহার্য সামগ্রী থেকে বঞ্চিত ছিল, তখন ঐ শ্রেণির

মহিলারা বিশেষ বিশেষ পোশাক নির্মাতা ও কেশসজ্জাকারীদের ডেকে আনত। (Muhajeri, 1983: 22)

সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা এত বেশিছিলযে, তা জনগণের জীবনের সর্বত্র বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থার বির"দ্ধে বিদ্রোহ করা, সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করা এবং একটি ইসলামি সাংস্কৃতিক চালু করাই হচ্ছে এ অবস্থার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সংস্কৃতিই প্রতিটি বিপ- বের মৌল অবকাঠামো। তাই এ মনোভাব ইরানি জাতির প্রকৃত ও অপরিহার্য অভিপ্রায় থেকে পৃথক নয়। সে অভিপ্রায় হচ্ছে একটি ইসলামি সরকার গঠন। এ কারণেই সাংস্কৃতিক বিপ- ব ছাড়া কোনো প্রকৃত বিপ- ব টিকে থাকতে পারে না। (Muhajeri, 1983: 24)

০৯। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা:

ইরানের ন্যায় ধনী দেশসমূহের জনগণের তুলনায় স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদ-বিশিষ্ট দেশের জনগণের জন্য অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা হয়ত অপেক্ষাকৃত কম গুর"ত্বপূর্ণ। যদি ইরানি জনগণের এমন একটি ধর্ম থাকত যে ধর্মে ন্যায়ানুগ ও স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা নেই, তাহলে যে জনগণের পক্ষে পূর্ব, পশ্চিম বা উভয়ের উপরই অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ব্যাপারটি সহ্য করা সহজ হত। কিন্তু ইরানের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যাপক এবং ইসলামি শিক্ষায় এমন এক

ন্যায়ানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে যা বিশ্বের বর্তমানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর চেয়ে ভালভাবে কাজ করে।

এঅবস্থার মধ্যেও পাহলভি শাসকগোষ্ঠীর শাসনকালে ইরানের অর্থনীতি বিশ্ব নিপীড়কদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পাহলভি শাসকগোষ্ঠীইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবহেলা করত, রূপায়ন করত পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এমনকি পুঁজিবাদী অর্থনীতিও প্রকৃত শিল্পের পথে রূপায়ন করত না। এরা যৌথ কারখানা গড়েও পশ্চিমা পণ্যের বাজার তৈরি করে। এটাই ছিল নির্ভরশীলতার কারণ। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের পর্যাপ্ত মাধ্যম থাকলেও পাহলভি শাসকগোষ্ঠী খাদ্য আমদানি করত। কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার মত জনশক্তি যাতে না থাকে সে জন্য শহরে চলে আসার জন্যও কৃষকদের উৎসাহিত করত। ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা অনুসারে গ্রাম থেকে আসা লোকদের হয় সংযোজন শিল্পে কাজ দিয়ে নতুবা লটারীর টিকিট বিক্রি বা চুরি অথবা অন্যান্য যৌথ অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে শহর-নগরে ও শিল্পাঞ্চলে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হত। সংযোজন কারখানাগুলো ঔপনিবেশিক দেশের সাথে সম্পর্কিত ছিল। কোনোটি ঐসব দেশের বা ঐ দেশেগুলোর ধনীদের মালীকানাধীনও ছিল। (হোসেন: ২০১৩: ৩৪৬)

পরনির্ভরশীল অর্থনতি ও অর্থনৈতিক অনাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে, তেল, তামা, লোহা, কয়লা ও সীসা জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে, ১৬ লাখ বর্গকিলোমিটার কৃষিজমি পুনর"দ্ধারে জনশক্তির ব্যবহার এবং

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র নয়-ইসলামের ভিত্তিতে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার বাসনাই ইরানি জনগণকে পাহলভি শাসকগোষ্ঠী উৎখাত করে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ যুগিয়েছে। এ স্বনির্ভর অর্থনীতি হচ্ছে এমনই এক তৃতীয় পথ-যে ব্যবস্থায় সম্পদ একজনের বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সরকারের মতো একটি বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি হয়ে পরে। (Muhajeri, 1983: 26)

১০। সামরিক নির্ভরশীলতা:

পাহলভি শাসকগোষ্ঠীর সময়ে তেল বিক্রি করে অর্জিত ইরানের বিপুল অর্থ আমেরিকান ও ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং ইসরাইলের কাছ থেকে অস্ত্র ক্রয়ে ব্যয় করা হত। তবে এ অস্ত্র ইরানের স্বাধীনতা রক্ষায় একবারও ব্যবহার করা হয়নি। এসব অস্ত্র রক্ষণা-বেক্ষণ ও আমেরিকা সামরিক উপদেষ্টাদের বেতন প্রদানের অর্থ ইরানি জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ইরান সোভিয়েত ইউনিয়নের বির"দ্ধে আমেরিকান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত। এজন্য ইরানকে অর্থ প্রদানের পরিবর্তে আমেরিকান সরকার নিজের সামরিক লোকদের বেতনের জন্য ইরানের কাছ থেকে অর্থ নিত। ইসলামি দেশসমূহের বির"দ্ধে যুদ্ধে ইসরাইল ইরানি বাহিনীর অস্ত্র-সস্ত্র ব্যবহার করত। ১৯৬৭ও ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় ইসরাইলী বিমান ইরানি বিমান ঘাঁটিগুলো থেকে তেল নিত, ইসরাইলী সেনাবাহিনী ব্যবহার করত ইরানি বাহিনী এবং এভাবেই আ"ড়র্জাতিক ইয়াহুদিবাদ সাহায্য-সহযোগিতা লাভ

করতো। ইরানের সামরিক বাহিনী খুবই দক্ষ হলেও এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমেরিকানদের চেয়ে দক্ষ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমেরিকানদের তুলনায় দক্ষতা, গুণাবলি ও ক্ষমতার সমকক্ষ হলেও তাদেরকে আমেরিকানদের নিয়ন্ত্রণ ও আমেরিকানদের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হত। কোনোভাবেই ইরানি বাহিনীর সিদ্ধান্ড় গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না। একজন আমেরিকান নন-কমিশন অফিসারের অধীনে এমনকি আমেরিকানদের চেয়ে কম বেতনে ইরানি অফিসারকে কাজ করতে রাজি হওয়া ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক। কেবল জনগণ নয়, সামরিক লোকদের জন্যও এ ব্যবস্থা ছিলঅসহনীয় ও অগ্রহণযোগ্য। তাই ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ইরানি জনগণের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলসামরিক ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়া। ইরান এমন এক স্বাধীন, সুসজ্জিত সেনাবাহিনী চায়, যে বাহিনী দখলদার ইয়াহুদি বাদের থেকে দেশকে রক্ষা করা ছাড়াও সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিতদের সহায়ক হিসেবে, বিশ্বের নিপড়ীকদের আধিপত্য নির্মূলকরণের শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারবে। (Muhajeri, 1983: 26-27)

১১। রাজনৈতিক পরনির্ভরশীলতা:

ইসলামি শিক্ষা অনুসারে মুসলমানরা অমুসলিম দেশ ও জাতির সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে, তবে এ ধরনের সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। দুর্বলের অধিকারের প্রতি অবেহলা প্রদর্শনকারী এবং বঞ্চিত দেশসমূহকে নিপীড়নকারী ও এসবদশের অধিকার লঙ্ঘনকারী দেশের সাথে

কোনো ইসলামি দেশের গুর"ত্বপূর্ণ সম্পর্কে রাখা উচিত নয়। পাহলভি শাসনামলে কেবল ইসলামের এই সুনির্দিষ্ট নীতিমালাই লঙ্ঘিত হতো না, বরং পাহলভি-শাসকগোষ্ঠী ইরান ও অন্যান্য দেশের উপর উপনিবেশবাদীদের থাবা বিস্ড়ৃত করতে সর্বাত্মক সাহায্য করত। ১৯২০ সালে বৃটেনের হস্ড়ক্ষেপের মধ্য দিয়ে পাহলভি বংশের শাসনকার্য শুর" হয়েছিল। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে বরখাস্ড় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ড় রেজা খানের শাসন অব্যাহত থাকে। বৃটেনের সরাসরি হস্ড়ক্ষেপের মধ্য দিয়ে তার পুত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালের ১৯শে আগস্ট বৃটিশ সহায়তায় আমেরিকান অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাহ ক্ষমতাসীন হয়। রেজাশাহপাহলভির অধীনে ইরানের সরকার ছিলপুরোপুরি বংশভিত্তিক। (Muhajeri, 1983: 27)

১৯৬৪ সালে স্বাক্ষরিত ও মজলিসে অনুমোদন প্রাপ্ত লজ্জাকর চুক্তিটির তীব্র প্রতিবাদ করেন ইমাম খোমেনী। এ চুক্তি অনুসারে আমেরিকান নাগরিকদের বিচারের এখতিয়ার কোনো ইরানি আদালতের ছিল না। এ প্রতিবাদের কারণে সিআইএ-এর নির্দেশে শাহের সাভাক ইমাম খোমেনীকে গ্রেফতার করে ও তুরস্কে নির্বাসনে পাঠায়। এ চুক্তি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাহলভি শাসকগোষ্ঠীর চুক্তিগুলোর নমুনা এবং এটাই পরিস্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে, বিদেশিদের সাথে এই শাসকগোষ্ঠীর কি ধরনের রাজনৈতিক সখ্য ছিল। এ চুক্তি অনুসারে আমেরিকান যেকোনো নাগরিক যে অপরাধই কর"ক না কেন, তার জন্য ঐ আমেরিকানের কোনো বিচার চলবে না। তাদের নাকি

আমেরিকান আদালতে বিচার হবে। তাছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে শাহ ইসরাইল ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে দহরম-মহরমও ভাল ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করে। ইরানের জনগণ দখলদার ইসরাইলী সরকারকে গভীরভাবে ঘৃণা ও দখলকৃত প্যালেষ্টাইনের মুসলমান ভাইদের সমর্থন করলেও শাহ সরকার বঞ্চিত জনতার শ্রমে উৎপাদিত সকল ক্ষমতা ইয়াহুদিবাদীদের সমর্থনে ব্যবহার করে। বর্ণবাদী রোডেশীয় সরকার, ঔপনিবেশিক ও ক্ষমতা দখলকারী দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইনে পরনির্ভরশীল মার্কোস সরকার এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ইরানিদের তীব্র ঘৃণা থাকলেও এদের সাথেই ছিলশাহ সরকারের ভাল সম্পর্ক। শাহ এদের কাছে তেল বিক্রি করত, এদের দিত আর্থিক সাহায্য, রাজনৈতিক সমর্থন, বঞ্চিত দেশসমূহের বির"দ্ধে বহু ষড়যন্ত্রে শামিল হত, এদের সাথে করত অসহযোগিতা। (Muhajeri, 1983: 28)

পাহলভি সরকার যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি উত্তরের প্রতিবেশী সোভিয়েত ইউনিয়নকে সন্তুষ্ট করতে চাইত। ইরানি জনগণের সম্পদ সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেয়া হয় এবং সে দেশের সাথে সম্পাদিত হয় কয়েকটি উপনিবেশিক চুক্তি। ভাড়াটে শাহ পশ্চিমা শিবির ও পূর্বশিবিরকে ইরানের সম্পদ লুট করতে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও তার পশ্চিমা মিত্ররা ইরানের তেল সম্পদ লুট করে। রাশিয়া নেয় ইরানের প্রাকৃতিক গ্যাস। রাশিয়া তার আশ্রিত দেশগুলোকে উৎসাহ যোগায় ইরানকে শিল্প ও কৃষিতে আরো নির্ভরশীল করে তোলার কাজে হাত মেলাত।

ইরানের অভ্যন্ড়রে শাহ জনগণের জন্য একটি ভিন্ন ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করে। তারা প্রচার মাধ্যমে ঘোষণা করে যে, "সে পূর্ব ও পশ্চিম উভয়ের সাথেই ভাল সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম। শাহ-ই ছিল তার রাজতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা।" (Muhajeri, 1983: 29)

দেশের সম্পদ ও স্বাধীনতাকে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ভাগ করে দেয়া সত্ত্বেও 'ক্ষমতা ও স্বাধীনতা' থেকে শাহ 'অলৌকিক' ঘটনাই ঘটিয়েছিল। "স্থিতিশীল দ্বীপ" এ শব্দটি ইরানি জনগণের মানসিকতার ওপর ছাপ মেরে দেয়া হয়। উপনিবেশবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ইরান নিশ্চয় স্থিতিশীল দ্বীপ ছিল। কারণ, তারা সহজেই সম্পদ লুট করতে পারত। শাহ কেবল তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধাই তৈরি করেনি, দুনিয়া লুটে নেয়া বৃহৎ শক্তিদের পক্ষেএ অঞ্চলের নিরাপত্তাও রক্ষা করত ভালভাবে। কিন্তু এ "স্থিতিশীল দ্বীপ" এক ঝর্ণার সামনে দাঁড়িয়েছিল। এ ঝর্ণা তৈরি করেছিলসে দেশের মুসলমান জনগণের আর্তনাদ ও হুংকার যা অবশেষে "পাহারাদার" ও তার প্রভুদের পারস্য উপসাগরে নিক্ষেপ করে। (Muhajeri, 1983: 29)

১২। স্বাধীনতা দমন-পীড়নঃ

ইরানের জনগণ শাহ সরকারের সকল অপরাধ ও কুকর্মের মুখে নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেনি। ইরানি জনগণ ইসলামি সংস্কৃতির বিকৃতি নীরবে মেনে নেয়ান। তারা সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে দেশের

ক্রমবর্ধমান পরনির্ভরশীলতা দেখে শাহের ভাড়াটে সরকারের বির"দ্ধে প্রতিবাদ না করে বসে থাকতে পারেনি। রেজা খানের সময় থেকে পাহলভি সরকারের বির"দ্ধে সংগ্রাম শুর" হয়েছিল। এ সময় ইমাম খোমেনী 'কাশফুল আসরার" রহস্য উন্মোচন শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রেজা খানের সরকারের ক্রিয়াকান্ড সম্পর্কে বইটি রচিত হয়। ইমাম খোমেনী যখন মনে করেছিলেন যে, রেজা খান সিংহাসনের বা রাজত্ব পরিচালনায় অযোগ্য ঠিক তখন থেকে তিনি রাজতন্ত্র উৎখাতের সংকল্প নেন। ১৫ইখোরদাদের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ড় ব্যাপক সংগ্রামের উপযুক্ত পরিস্থিতি ছিলনা। ইমাম খোমেনী পাহলভি শাসনের বির"দ্ধে স্পষ্টবাদী অবস্থান গ্রহন পূর্ব পর্যন্ড় শাহ বিরোধী কর্মীরা সাধারণত আইনের কাঠামোর মধ্যে কাজ করত। ইমাম খোমেনীর সংগ্রামের পূর্বে তাঁর কর্মীরা শাসকগোষ্ঠীকে দেশের আইন যেন চলতে বাধ্য করত। প্রথম দিকে তারা সরকার উৎখাতে আগ্রহী ছিলনা। কিন্তু ১৫ই খোরদাদের অভ্যুত্থানের পরে ইরানের ধর্মীয় শক্তিসমূহ সংগ্রামকে রাজতন্ত্র উৎখাতের সংগ্রামে পরিচালিত করে। ১৫ই খোরদাদের গণঅভুত্থানের পূর্বে ইমাম খোমেনীরও এই মনোভাবছিল। ১৫ই খোরদাদ (জুন ১৯৬৩ জুন) ও ২২শে বাহমান (১১ ফেব্র"য়ারি, ১৯৭৯)-এর মধ্যবর্তী কারাজীবন ও নির্বাসনের দীর্ঘ সময়ে ইমাম খোমেনী ইরানি জাতির প্রতি বক্তৃতা-বিবৃতিতে রাজতন্ত্র উৎখাতের জন্য প্রকাশ্য আহবান জানান। ফলে, শাহের গোয়েন্দা বিভাগ ও গুপ্ত পুলিশ বাহিনী 'সাভাক' কেবল সরকার উৎখাতের প্রবক্তাদেরই দমন, কারাগারে অত্যাচার করে হত্যা করত না, এমনকি রাজতন্ত্রের প্রভাব শিথিলের আভাস দানকারী মুক্তি

আন্দোলনের সদস্যদের ও শক্ত হাতে শায়েস্ড়া করত। বিশেষত ২৮শে খোরদাদের (১৯শে আগস্ট ১৯৫৩) অভ্যুত্থানের পরে সেন্সরশীপ এবং দমনপীড়ন এত বেড়ে গেল যে, রাজতন্ত্রের অনুমোদিত আইনের মধ্যে থেকেও কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানো সম্ভাবনা ছিল না। ইমাম খোমেনীর বই, ছবি বা প্রবন্ধ রাখা নিষিদ্ধ ছিল। যার কাছে এগুলো পাওয়া যেত, তার জন্য ছিল মৃত্যুদ- বা অত্যাচার ও দীর্ঘ কারাজীবন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ড় ইরানের সকল অঞ্চলের সকল শ্রেণির লাখ-লাখ মানুষকে ভাষণদান, বই বা প্রবন্ধ লেখা বা রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার দায়ে দোষী সাব্যস্ড় করা হয়। (Muhajeri, 1983: 30)

ইমাম খোমেনীর বিবৃতি, ভাষণ, বই বা ছবি অথবা সংশি্লষ্ট অন্য কোনো সামগ্রী বিতরণ করা শাহের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য হত। এসব কাজে নিয়োজিত লোকদের সাভাক চরেরা কারাগারে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করত। আলেমগণ কারাগারে বছরের বছর অন্ড়রীণ থাকতেন। ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিকও কেরাণিরা শাহের কারাগারে মারা যেত বা পঙ্গুত্ব বরণ করতো। আন্দোলনকারীদের স্বীকারোক্তি আদায়ে সাভাক চরদের বহু ধরনের পন্থা ছিল। এর মধ্যে মানসিক অত্যাচারছিল এমন যে, বন্দীকে বলা হত সবকিছু স্বীকার করার জন্য সে স্বীকারোক্তি না দিলে, তারই সামনে তার স্ত্রী, কন্যা বা বোনকে ধর্ষণ করা হবে বলে ভয় দেখানো হতো। দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র ছিলসাভাকের উপস্থিতি। শাহ সরকারের সেবার জন্যলাখ লাখ

সাভাক চরকে বিপুল পরিমাণ বেতন দেয়া হত। বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা, মসজিদ, রাস্ড়া, স্কুল, এমনকি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও পরিবারের মধ্যে ছিলতাদের উপস্থিতি। মানুষ পরস্পরকে বিশ্বাস করত না। এ রকম অবস্থাতেই ইরানের মুসলিমজনগণ ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে জেগে ওঠে জীবন ত্যাগ করে সে সময় ৬০ হাজারের বেশি মানুষ শাহাদাত বরণ করে বিকলঙ্গ হয় ১ লাখ এবং শাহের ফ্যাসিষ্ট শাসনের ওপর বিজয় অর্জন করে। (Muhajeri, 1983: 32)

দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইরানি জনতা আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায়। এ রাজতন্ত্র সিআইএ মোসাদের মত গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সাহায্যে অনাচার ও দমন-পীড়ন ছাড়া জনগণকে আর কিছুই দেয়নি। জনগণ নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ইসলামি প্রজাতন্ত্রের পবিত্র সরকার প্রতিষ্ঠা করে। যাতে সংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যদের উপর নির্ভরশীলতার অবসান হয়, এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্যইরানি জনগণ আল-াহর কোরআন ভিত্তিকে একটি ইসলামি সরকার চেয়েছিল। আল-াহর সাহায্যে তারা একটি ইসলামি সরকারের অধীনে তাদের নিজেদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি বিপ□ব প্রতিষ্ঠায় জাতীয় জাগরণের তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সনে ইরানের ইসলামি বিপ-ব যে সফলতায় পর্যবসিত হয়েছে তা নিছক একটি রাজনৈতিক বিপ—ব ছিল না, বরং এটি ছিল একটি আদর্শিক জাগরণ। ইসলামি বিপ-বের ঢেউ দ্র ত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্তর্জাতিক পরিম লে অনস্বীকার্য বাস্ড়বতায় পরিণত হয়।

ইরানে ইসলামি বিপ—ব সংঘটিত হওয়ার মূল চেতনা পবিত্র কোরআনের সুরা কাসাসে বর্ণিত আয়াত থেকে গৃহীত হয়েছিল। এ আয়াতে আল—াহ তায়ালা বলেন:

> দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। (সুরা কাসাস, আয়াত ৫)

মূলত এ আয়াতের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল। এটা এ কারণে যে, মজলুম বা অসহায় জনতার ওপর যে কর ণা আল—াহ করেছেন তা এ বিপ—ব ও সংগ্রামেরই ফসল– যা আল—াহ প্রদত্ত অবদানেরই উত্তরাধিকার।

ইরানের ইসলামি বিপ-ব ক্ষমতা বদলের ঠুন্কো লক্ষ্যে সংঘটিত হয়নি। বিপ-বের নেতা তেহরানের ক্ষমতার প্রাণকেন্দ্রে শাসনদ হাতে তুলে নেননি। তিনি অবস্থান করেন আধ্যাত্মিক নগরী কোমে। বিপ-বের বাতিঘর হয়ে দিতে থাকেন পথনির্দেশনা। তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বই ছিল বিপ-বের

চালিকাশক্তি। সমসাময়িককালে লি কুয়ান ইউ, ড. মাহাথির মোহাম্মদ, নেলসন ম্যান্ডেলা নিজ নিজ দেশে অনেক বড় সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন। তাতে উপরিকাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আসলেও মনন ও চেতনায় খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বের ব্যাতিক্রম দিকটি হলো এই যে, তিনি বিপ-বোত্তর ইরানের ক্ষমতার হাল ধরেননি। গ্রহণ করেছিলেন পথনির্দেশকের এক অনন্য ভূমিকা। তিনি দেশ শাসনের বিষয়টি যোগ্য লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে পালন করেছেন আদর্শিক নেতৃত্বের গুর"দায়িত্ব।

ইমাম খোমেনী বিশ্বাসের অমোঘ শক্তির ওপর সর্বোচ্চ আস্থা রেখেছিলেন। দীর্ঘ প্রবাস জীবনে তিনি ইরানি জনতার আধ্যাত্মিক শক্তি ও বিশ্বাসকে শানিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। কেননা, তিনি জানতেন, শক্তি ও ক্ষমতা ব্যতিরেকেই নৈতিক মূল্যবোধের অপার শক্তি মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই বাহৃত ইরানের বাইরে অবস্থান করেও তিনি তাঁর লেখা ও বক্তব্যের মাধ্যমে ইরানি জাতির মননে বিশ্বাসের ভিত তৈরী করেছিলেন, তাদের চেতনার প্রোথিত করেছিলেন ইসলামি বিপ-বের আকাঙ্খা। ফলে ইরানের আপামর মানুষ ইসলামি জাগরণের স্বপ্নে জেগে ওঠে। শাহের প্রভু যুক্তরাষ্ট্রের মদদে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও সেই জাগরণ ঠেকাতে পারেনি। ইমাম খোমেনী (র.) বিপ-বের বীজ বুনেছিলেন ইরানি জনতার মনন, মেধা ও চেতনায়। একটা জাতি তিলে তিলে বদলে গিয়েছিলআর তারা বদলে দিয়েছিলইরানকেও। ইমাম

খোমেনী (র.) ইরানকে অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নেননি। প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানচর্চায় যোজন যোজন পথ পাড়ি দিয়েছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান। পারমাণবিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহারে ইরানের সক্ষমতা আজ বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ইমাম খোমেনীর দিকনির্দেশনায় ইরনের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ঈর্ষণীয়। এমনকি সাংস্কৃতিক কর্মকাে ও ইরানের সাফল্য অনবদ্য। ইরানি চলচ্চিত্র বিশ্ব চলচ্চিত্রের অঙ্গনে এক বিস্ময়কর মডেল। ***তারাজ, লিটল বার্ড অব হ্যাপিনেসের*** মতো চলচ্চিত্র প্রচলিত চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে প্রচ ঝাঁকুনি দিয়ে নতুন এক দিগন্ড় খুলে দিয়েছে। প্রায় ৪০ বছর ধরে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে ইমাম খোমেনীর নির্দেশিত পথে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সুশাসন, নির্মল সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল মডেল হিসেবে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে।

তিনি ইসলামের খাঁটি এবং শক্তিশালী ব্যবস্থার কুঁড়িগুলোকে ফোটানোর চেষ্টা করেছেন এবং ইসলামকে একটা জীবন দ্বীন হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই জীবন বিধান জনগণ এবং সমাজকে দ্রুত স্বাধীনতা ও মুক্তির দিকে ধাবিত করে। ইহিতাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী পবিত্র ধর্ম ইসলাম এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অগ্রসরমান এবং ইসলামের অনুসারীর সংখ্যাও ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

একটি সমাজের সক্রিয়তা ও জাগরণের জন্য গুর ত্বপূর্ণ যে দিকটির প্রতি গুর ত্ব দেয়া প্রয়োজন তা হলো ব্যক্তিত্বের অনুভূতি। একটি জাতি যদি নিজেদের ব্যক্তিত্ববোধের উপলব্ধি না করে, সে জাতি কোনো দিনই জাগরণ

ঘটাতে পারবে না। এই ব্যক্তিত্ববোধই হলো নিজেদের আদর্শের ওপর অটল থাকা এবং অন্য কোনো মতদর্শের ওপর নির্ভর না করাটাই জাতীয় ব্যক্তিত্ববোধ। একটি সমাজের উচিত তাদের নিজস্ব দর্শনের ওপর নিজেদেরকে এগিয়ে নেয়া।

ইমাম খোমেনী যে বিষয়গুলোর উপর গুর"ত্বারোপ করে জনগণকে জাতীয় জাগরণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস। তাঁর দৃষ্টিতে জাগরণের মূল চালিকা শক্তি হলো দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাস। যে বিশ্বাসের শক্তিবলে পরাশক্তির বির"দ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না, এমনকি সমাজে নিরাপত্তা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতেও কুণ্ঠিত হয় না। যে বিশ্বাস দ্বীন এবং রাজনীতিকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মনে করে আর পরনির্ভরতাকে যথার্থ বলে মেনে নেয় না। ইসলামকে জুলুম-নির্যাতনের বির"দ্ধে সংগ্রাম ও জাগরণের গুর"ত্বপূর্ণ শক্তি বলে তিনি মনে করতেন। এই শক্তিতে বলীয়ান হয়েই ইরানি জনগণের জাগরণ তৈরী হয়েছিল। (আলগার, ১৪৩৩ হি.: ২৮)

ইমাম খোমেনী (র.) ইসলামি বিপ- বকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সারা বিশ্বের সকল প্রান্ড় থেকে প্রতিধ্বনি না শোনাা পর্যন্ড় বিপ- বের প্রচার অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে যতক্ষণ বিশ্বের কোনো না কোনো অংশে জালিমের বির"দ্ধে মজলুমের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। তিনি বিশ্বাস করতেন সর্বত্র ইসলামি বিপ- বের বার্তা পৌঁছে দেয়া একটি দায়িত্ব।

মানবসভ্যতার প্রতি ইসলামি বিপ-ব তার দায় এড়াতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের ইসলামি বিপ-বের দাওয়াত পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ইমাম খোমেনী (র.) কখনই ভয় ও শক্তি প্রয়োগে ইসলামি বিপ-ব প্রসারের দিকনির্দেশনা দেননি। যেমনটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিজম রপ্তানির ক্ষেত্রে করেছে। ইমাম খোমেনী (র.) মুসলিম সত্তা ও হৃদয়কে জেগে উঠতে প্রণোদনা দিয়েছেন, ইসলামের মানবতাবাদী সাহিত্যের উপদানে সমৃদ্ধ হয়ে জাগরণের জোয়ার তৈরি করতে বলেছেন। বিপ-বের ডাক যে সম্প্রসারণবাদ নয় তাও স্পষ্ট করেছেন ইমাম খোমেনী। তিনি ইসলামি বিপ-বের প্রচারকে একটি চিন্ড় াধারা বা মানবের বিপ-ব হিসেবে চিহ্নিত করে সম্প্রসারণবাদের ভ্রান্ড় ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি ইসলামি বিপ-বের চিন্ড়াধারাকে মুসতাদআফিনের অনুসৃত পথ বলেও অভিহিত করেছেন। (মজিদী, ১৯৯৭ : ২৩)।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ইসলামি বিপ—ব এক নতুন রাষ্ট্র, নতুন সমাজ, নতুন সংস্কৃতি তৈরি করেছে। ক্ষমতা, ব্যক্তি ও সম্পদকেন্দ্রিক রাজনীতির স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিক ও প্রশাসকরা। তাঁদের নির্দেশনায় ওপর আছেন রাহবার বা সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা এবং গার্ডিয়ান কাউন্সিল। ইসলামি বিপ-বের মৌল চেতনা কেউ যাতে ব্যাহত করতে না পারে সে জন্য এই অনন্য সাধারণ ব্যবস্থা। যে কারণে ইমাম খোমেনীর ওফাতের পরও ইসলামি বিপ—ব অক্ষুন্ন-রয়েছে। তার সুবাতাস ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

অগ্নিগর্ভ মধ্যপ্রাচ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান স্বমহিমায় বিরাজমান। কেননা, ইমাম খোমেনী (র.) ইরানি জনতার চেতনার ভিত্তিমূলে প্রোথিত করেছিলেন বিপ-বের বার্তা। বিশ্বাসের শক্তি আর বিপ-বী চেতনার অনন্য প্রণোদনায় ইরান বিকশিত হচ্ছে। ইসলামি বিপ-বের বার্তা জোরালোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে আরব-আজম সর্বত্র। এখন আর ইসলামকে পারলৌকিক ব্যাপার বলে আগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না।

পৃথিবীর সকল পরাশক্তি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দরিদ্র জাতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের অপপ্রয়াসে লিপ্ত। জ্বালানি তেলের সরবরাহের ওপর আধিপত্য বিস্ড়রের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র তেলসমৃদ্ধ ইরাকে দখলদারিত্ব কায়েম করেছে। অন্যদিকে কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে আফগানিস্ড়ানে আগ্রাসান চালিয়েছে। কিন্তু ইরানের বিপ-ব সে দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই বিপ-বের আদল, সংগ্রামের কৌশল এবং প্রণোদনা অন্য যে কোনো বিপ-বের চেয়ে আলাদা। ইমাম খোমেনী (র.) ইসলামি বিপ-বকে বিশ্বব্যাপী প্রচারের উদাত্ত আহবান জানালেও বল প্রয়োগে বিপ-ব রপ্তানি বা প্রসারের কোনো দিক-নির্দেশনা দেননি। তিনি শুধু মুসলিম বিশ্বেই বিপ-ব প্রসারের কথা বলেননি, বরং তিনি বিশ্বের সকল মুসতাদআফ তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট এই বিপ-বের বার্তা পৌঁছে দিতে বলেছেন। ইমাম খোমেনী (র.) আরো বলেছেন, বিপ-ব ছড়িয়ে দিতে হবে সেই সব দেশে যেখানে রাষ্ট্র নির্যাতনকারীদের মোকাবিলায় দুর্বল। এমন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে

হবে- যা সাম্রাজ্যবাদের দোসর, নিপীড়ক, হত্যাকারীর সরকার নয়। এক্ষেত্রে তিনি ইরানি মডেলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেখানে মানুষ জেগে উঠেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। ইমাম খোমেনী (র.) জনগণের ইসলামি জাগরণী শক্তির ওপর গুর"ত্বারোপ করেছেন। তিনি বেয়নেটের মাধ্যমে বিপ- ব প্রচারের কথা বলেননি, বরং তাঁর মতে বিপ- বের প্রকৃত প্রসারের লক্ষণ হলো ইসলাম, ইসলামি ধ্যানধারণা এবং ইসলামিক ও মানবিক নৈতিকতাবোধের ব্যাপক উন্নয়ন। (নিউজ লেটার, ২০১৩: ৭)।

ইমাম খোমেনীর মতে বিপ- ব রপ্তানি মানে ইসলামকে আবিস্কৃত অবস্থায় উপস্থাপন, ইসলামের সৌন্দর্যের প্রচার এবং জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রতি আগ্রহ ও আসক্তি সঞ্চার করা। ইমাম খোমেনী (র.) দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, বিপ- ব মানে কারো বির"দ্ধে যুদ্ধ নয়, বরং বিপ- ব হলো চি"ড়া ও চেতনার আমূল পরিবর্তন। তিনি ইসলামি বিপ- বের ধারণা ও মূল্যবোধ পাকাপোক্ত করার পাশাপাশি সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তা চর্চা করতে বলছেন। সেজন্য ইমাম খোমেনীর বিপ- ব রপ্তানির তত্ত্ব কোনো রণনীতি নয়, বরং এটি ইসলামি চেতনা ও মূল্যবোধ প্রচার ও প্রসারের এক কার্যক্রম যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে অন্যায়ের বির"দ্ধে প্রতিবাদের দ্রোহী চেতনা এবং আধ্যাত্মবাদ প্রসারিত হয়। (নিউজ লেটার, ২০১৩ : ৮)।

ইমাম খোমেনী (র.) ইরানের ইসলামি বিপ- বের আসল শক্তি নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, বিশ্বাস ছাড়া ইরানের আর কোনো শক্তি নেই। বিশ্বাসের

জোরে ইরানি জাতি সকল অপশক্তিকে পরাহত করেছে। এই বিপ□ব অবতীর্ণ হয়নি বা চাপিয়ে দেয়া নয়, বরং ইরানের ইসলামি বিপ- বের কুশিলব ইরানি জনগণ। আর যখন জনগণ হয় বিপ- বের চালিকাশক্তি, তখন কেনো গোষ্ঠী বা চক্র তা দমন করতে পারে না। আজকের ইরানি বিপ—ব, ইরানের সংবিধান ও সরকার ইরানি জনগণের সৃষ্টি। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে ইসলামি বিপ- বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সংশি- ষ্ট জনগোষ্ঠীকে ইসলামি বিপ- বের চেতনায় জেগে উঠতে হবে এবং বিপ- ব সংঘটিত করতে হবে। (নিউজ লেটার, ২০১৩ : ৮)

ইমাম খোমেনী (র.) বর্তমান বিশ্বে পরাক্রমশালী মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারণার বিষয়ে ওয়াকেবহাল এবং সচেতন ছিলেন। তিনি প্রচারণাকে ইসলামি আদর্শ প্রচারের বাহন হিসেবে দেখেছেন এবং এর মাধ্যমে বিশ্বামনবতাকে সঠিক পথ দেখানোর তাগিদ দিয়েছেন। ইমাম খোমেনী (র.) প্রচারণার মাত্রাকে জোরদার করতে তাগিদ দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্ব নানামুখী প্রচারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রচারণাই সকল কর্মকা ের কেন্দ্রবিন্দু। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ প্রচারণাই ইয়াহুদিবাদ-নিয়ন্ত্রিত। যা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্য ও ভুল বুঝাবুঝি তৈরি করছে। সে ক্ষেত্রে ইসলামি বিপ- বের ধারকের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য সঠিক প্রচারণা চালানোর বিকল্প নেই।

গণমাধ্যমের গুর ত্ব সম্পর্কে ইমাম খোমেনী (র.) সজাগ ছিলেন। তিনি গণমাধ্যমকে একটি দেশের শিক্ষাদাতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যাদের

কর্তব্য হলো প্রতিটি ব্যক্তি এবং সামগ্রিকভাবে জাতিকে শিক্ষিত করা এবং সর্বোপরি জাতির সেবা করা। ইমাম খোমেনী (র.) জানতেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করা কৃষকও আজকাল রেডিও শোনে। তাই গণমাধ্যমে ইসলামের প্রচারণা বাড়াতে হবে। কেননা, ইসলামি বিপ-বের দায়িত্ব হলো ইসলামকে বিশ্বের সর্বত্র উপস্থাপন করা। (নিউজ লেটার, ২০১৩: ৮)

ইমাম খোমেনী (র.) জোর দিয়ে বলেছেন, মসজিদ হবে ইসলামি বিপ-বের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। যেমনটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে মসজিদ ইসলাম প্রচারের মূল কেন্দ্র। ইসলামের উষা লগ্নে এখান থেকে সেনাদল গঠিত এবং সংগ্রাম সূচিত হতো। ইমাম খোমেনীর মতো প্রচাণার দায়িত্ব কেবল বিশেষ কোনো মন্ত্রণালয়ের বা দপ্তরের নয়, বরং এটি সকল লেখক, বক্তা, শিল্পী এবং পণ্ডিত ব্যক্তির পবিত্র কর্তব্য।

ইমাম খোমেনী (র.) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যায়নবাদীদের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিরোধী প্রচারণায় বিষয়েও গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। তাদের প্রচারণার মূল বিষয় হলো ইসলামের বিরোধীতা। তাদের মতে ইসলাম কোনো বৈশ্বিক ধর্ম নয় কিংবা ইসলাম জীবন ঘনিষ্ঠ ধর্মও নয়। এর মধ্যে সমাজ গঠনের নীতিমালা ও ভিত্তি এবং সরকার পরিচালনার নীতিমালা বা কাঠামো অনুপস্থিত। এমনকি ইসলামকে 'প্রক্রিয়াশীল ধর্ম' আখ্যা দিয়ে বর্তমান সময়ে এটিকে অচল প্রতীয়মানের চেষ্টা চলছে। ইসলাম বিরোধীরা এমন ধুয়াও তুলছে যে, ইসলাম সভ্যতার বিকাশ এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি ও উদ্ভাবনের বিরুদ্ধে।

তারা আরও যুক্তি দেয় যে, আধুনিক রাষ্ট্রগুলো বিশ্বসভ্যতা ও তার সম্প্রতি অগ্রযাত্রাকে অস্বীকার করতে পারবে না। এক্ষেত্রে ইমাম খোমেনী (র.) মনীষী এবং গবেষকদের ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে অনুধাবন করে ইসলামকে সঠিকভাবে তুলে ধরার তাগিদ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি ধর্মবেত্তা ও ধর্ম প্রচারকদের দুর্বলতার দিকটিও তুলে ধরেছেন। ইমাম খোমইনীর দৃষ্টিতে তাঁরা ইসলামের তত্ত্ব, নীতিমালা ও আদর্শকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে নানা আনুষ্ঠানিকতায় ব্যস্ড় থাকেন। (নিউজ লেটার, ২০১৩ : ৮)।

ইমাম খোমইনী সার্বিক অবস্থার আলোকে পরিবর্তন এবং অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাত্রার জন্য জাতিসমূহের প্রতি জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এবং জাগরণকে পরস্পর নির্ভরশীল বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, "ক্ষুদ্র মতপার্থক্য ভুলে মুসলিম উম্মাহকে সচেতন, সজাগ এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামকে রক্ষা করতে হবে।" (আলোর পথে, ১৯৮৯: ২৯) কেননা, তাঁর ভাষায় এ সময়টি হচ্ছে জালিমের বির"দ্ধে মুসতাদআফিনের এবং মিথ্যার বির"দ্ধে সত্যের বিজয়ের সময়। তিনি মুসলিম বিশ্বকে মতানৈক্য ও বিভক্তির নৈতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে সাবধাণ করে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়: "ইসলাম এসেছে বিশ্বের সকল জাতি তথা আরব-আজম-তুর্কী প্রাচ্যকে একত্র করতে এবং একটি মহান উম্মাহ প্রতিষ্ঠিত করতে- যার নাম হবে 'ইসলামি উম্মাহ'।" (নিউজ লেটার, ২০১৩ : ৮)

তিনি ইসলামকে ঐক্যের ধর্ম বলে অভিহিত করে বলেছেন, ইসলামি বিপ-ব সকল দেশে এই বার্তাই পৌঁছে দিতে চায় যে, ইসলামের ভিত্তি হলো সমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্য। ' এরই ধারবাহিকতায় তিনি আহবান জানিয়েছেন: বিশ্বের মুসলিম যারা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী তারা জেগে উঠবে এবং তাওহীদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে এবং স্ব স্ব দেশে সম্প্রসারণবাদীদের প্রতিহত করে ইসলামের গৌরব ও প্রভা পুনরুজ্জীবিত করবে। ' (নিউজ লেটার, ২০১৩ : ৮)।

ইমাম খোমেনী বিশ্বাস করতেন, ইসলামি মূল্যবোধ এবং নীতিমালার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী জণজাগরণ মানবতার প্রকৃত মুক্তির নিয়ামক। এই জাগরণের স্রোতধারায় ইসলাম সারা বিশ্বে বিজয়ী হবে এবং সাম্রাজ্যবাদের মুলোৎপাঠিত হবে।

ইরানের ইসলামি বিপ-ব সংঘটিত হয়েছে মূলতসমাজে ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। ইতোমধ্যে তা জনসাধারণের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তুলেছে। ইরানি বিপ-বের বৈশিষ্ট্য ইসলামি হওয়ায় তা এই বিপ্লবকে অন্যান্য বিপ-বের উপর একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। মূলত ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ-বের চূড়ান্ড় লক্ষ্য ছিলরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার একটি সমাধান খুঁজে বের করা। (মজিদী, ১৯৯৭: ৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

আমরা ইরানের বিপ- বের অভ্যন্ড়রীন প্রভাবকে নিম্নোক্ত কয়েকটি দিক থেকে বিচার করতে পারি:

(i) ইরানের সামাজিক পরিবর্তনঃ

বিশিষ্ট বিপ□ব বিশে-ষক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ***স্টেটস এ্যান্ড সোস্যাল রিভোলিউশন*** (States and Social Revolution)-এ বলেছেন,

> একটি বিপ-বের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে থাকে রাষ্ট্র, শ্রেণি, কাঠামো ও কর্তৃত্বব্যঞ্জকদের আদলে দ্র ুতও মৌলিক পরিবর্তনের সাথে নতুন যে উপাদান যুক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে আদর্শের ধারণা, যেখানে অন্ড়র্ভুক্ত হয়েছে একটি সমাজের চিন্ড়াপদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক অন্র্ড়দৃষ্টি। সামাজিক সমর্থন প্রক্রিয়ার উন্নয়নের মাধ্যমে ইসলামি বিপ-ব সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নতুন মূল্যবোধ ও রীতি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সামাজিক অধিকার ভোগকারী নাগরিক সাধারণকে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী করে তুলেছে। এই উন্নয়ন সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে বিশেষত সমাজের অত্যন্ড় মৌলিকখাত হিসেবে শিক্ষার এবং সেই সাথে আর্থ সামাজিক সূচক যা বর্ধিত হারে মহিলাদেরকে বিভিন্ন কর্মকা ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। (নিউজ লেটার, ২০০২ : ১৪)।

ইসলামি বিপ-বের পর ইরানে সবচেয়ে উলে-খযোগ্য সামাজিক সাফল্যগুলো যা জাতীয় জাগরণের তৎপর্য হিসাবে চিহ্নিত তা হচ্ছেঃ

০১। কর্মসংস্থান ও কর্মশক্তিঃ

ইসলামি বিপ-বের পর বেকারত্ব, বিশেষ করে তর ণদের মাঝে এবং সাধারণভাবে সব সময় ইরানের একটি প্রধান সমস্যা আর্থ-সামাজিক সমস্যা

হিসেবে বিদ্যমান। ইরাক কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের বিস্ড়র ঘটার পর বহু শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, বিশেষ করে যুদ্ধ পীড়িত এলাকায়। এ ধরনের ঘটনা বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় ফলে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। সেই সাথে যুদ্ধের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অর্থনৈতিক প্রকল্পে বিনিয়োগ বন্ধ রাখতে হয়, অর্থনৈতিক কর্মকা- সীমিত হয়ে যায় এবং দেশের বেকারত্বের বিস্ড়র ঘটে। অবশ্য, ঐ চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ এবং প্রতিরক্ষা জেহাদের চাহিদা পূরণে সরবরাহ প্রচেষ্টা বেশ কিছু সংখ্যক তর-ণের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে।

চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে এক নবগযুগের সূচনা হলে একদিকে বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ শুর- হওয়ায় এবং অপরদিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ড় এলাকা পুনর্গঠনের আবশ্যকতা দেখা দেয়ায়, বেশ কিছু নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পাশপাশি স্বদেশি দক্ষ শ্রমশক্তির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধিতে তর-ণ সমাজের প্রতিভা ও বিকশিত হচ্ছে। এর ফলে গবেষণা প্রকল্পসমূহ এবং পণ্য উৎপাদনেও নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে। (*A Review of the Imposed War,* 1983: 38)

১৯৯৪ সালের মার্চে সমাপ্ত সাল তামামি পরিসংখ্যান অনুসারে ইরানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এক কোটি ৩৮ লাখ ২০ হাজার এবং বেকারত্বের হার শতকরা ১১ দশমিক ৪ ভাগ, ১৯৮৯ সালের সাল তামামি হিসাব অনুসারে দেশের মোট কর্মোপযোগী জনসংখ্যার মধ্যে বেকার

ছিলশতকরা প্রায় ১৫ দশমিক ৩ ভাগ। আর ১৩৬৭ ও ১৩৭২ ইরানি সালের মধ্যে বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩ দশমিক ৮ ভাগ। এর কারণ, ঐ সময়ে অর্থনৈতিক তৎপরতার বিস্ড়ার সেই সূত্রে নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং নতুন শ্রম শক্তির কর্মক্ষেত্র তৈরি হওয়া তাছাড়াও জনসংখ্যার একটি উলে-খযোগ্য অংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ড় পরিসংখ্যান অনুসারে ইরানে ৬ কোটি জনসংখ্যার এক কোটি ৭৭ লাখের মতো কর্মোপযোগী এবং তাদের মধ্যে এক কোটি ৫৮ লাখ কর্মে নিয়োজিত ছিল ঐ বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের মার্চ নাগাদ দেশটিতে বেকার লোকের সংখ্যা ছিল১৯ লাখ অর্থাৎ মোট কর্মোপযোগী লোকের শতকরা ১০ দশমিক ৭ ভাগ (নিউজ লেটার, ২০০২: ১৪)।

উপরিউক্ততথ্য নির্দেশ করে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৯৯৩-৯৪সালে ইরানে বেকারত্বের হার যেখানে ছিলশতকরা ১১ দশমিক ৪ ভাগ, সেখানে ১৯৯৬ সালে এসে তা কমেদাঁড়িয়েছে শতকরা দশ দশমিক ৭ ভাগ।

২। সাধারণ শিক্ষা:

ইসলামি বিপ-ব বিজয়ের পরে দেশটির শিক্ষা খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয় যা জাতীয় জাগরণের তাৎপর্য হিসাবে বিবেচিত ইসলামি বিপ—ব বছরগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়। দেশ পুনর্গঠনকালে এ চেষ্টা এত বেশি ফলপ্রসূ হয় যে, নারী শিক্ষার মানোন্নয়ন ও

সম্প্রসারণে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের অংশীদারীত্ব বৃদ্ধি করে। এ ব্যাপারে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান মধ্যপ্রাচ্যের অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ১৯৭৯ সাল (ইসলামি বিপ□বের বছর) থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ড় বছরগুলোর কিছু সূচক তুলনা করলে এ বিষয়ে পরিষ্কার পাওয়া যাবে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইরান কতটুকু অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং জাতীয় জাগরণের ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। নিচের এ বিষয়ের তথ্যগত পরিসংখ্যানগুলো তুলা ধরা হলো:

- স্কুলের সংখ্যা ১৯৭৮ সালে যেখানে ছিল ৫৪ হাজার, বর্তমান সংখ্যা এক লাখ দশ হাজারে উন্নীত হয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৭৯ সালে যেখানে ছিল৮ লাখ, ১৯৯৮ সালে এসে তা এক কোটি ৮০ লাখে উন্নীত হয়েছে।
- শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা ১৯৭৯ সালে আড়াই লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে সাড়ে ছয় লাখে উন্নীত হয়েছে।
- ১৯৭৮ সালে প্রতি ৩৪ জন প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্যএকটি শ্রেণিকক্ষ এবং প্রতি ৪০ জন নিম্নমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি শ্রেণিকক্ষ বরাদ্দ ছিল। ১৯৯৪ সালে এসে ঐ সংখ্যানুপাত দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে প্রতি ২৭ জনে একটিএবং প্রতি ৩০ জনে একটি শ্রেণিকক্ষে।

- ১৯৭৮ সালে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৩৮ ভাগ আর বর্তমানে শতকরা ৪৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে।
- বর্তমানে ইরানের মোট ১৭৫টি বিশেষ স্কুল ও শিক্ষা কেন্দ্রে প্রায় ৩৪ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী অধ্যায়ন করছে। ১৯৭৯ সালে ঐ সংখ্যা ছিল প্রায় শূন্যের কোটায়।
- ১৯৭৮ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা পরবর্তী বছরগুলোতে তা শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৮৯ ভাগে উন্নীত হয়েছে।
- ১৯৭৮ সালে বিতরণকৃত মোট পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি কপি। আর বর্তমানে তা ১৮ কোটি কপিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বই প্রকাশিত হয়েছে নয় শতাধিক বিষয়ে।
- নারী স্বাক্ষরতার হার ১৯৭৬ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে তা বর্তমানে শতকরা ৭৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে।
- ১৯৭৮ সালে ইরানি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট কর্মকর্তা, কর্মচারীর (প্রায় ৩৫ হাজার) শতকরা ১১ ভাগ ছিলবিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত আর বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে (২ লাখ ২৬ হাজার) শতকরা ২২ ভাগ হয়েছে।
- ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে ইরানি ছাত্ররা যথাক্রমে রসায়ন ও অংকশাস্ত্রে বিশ্ব অলিম্পিয়াডে প্রথম স্থান অধিকার করে। আর পদার্থবিদ্যা

বিষয়ক অলিম্পিয়াডে তারা তৃতীয় হয়। ১৯৮৮ সালে ইরানি ছাত্র-ছাত্রীরা ৬টি স্বর্ণপদক, ৯টি রৌপ্য পদক ও ৪টি ব্রোঞ্জপদক লাভ করে। ইসলামি বিপ-বের আগে, ইরানি ছাত্র-ছাত্রীরা কখনই এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি।

- ইরানে হাইস্কুলে ডিপে-মা বা নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১৯৭৯ সালের শতকরা ৭০ ভাগের তুলনায় কমে শতকরা ৩৫ ভাগ হয়েছে।
- শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ১৯৭৯ সালে ছিলই না, অথচ বর্তমানে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ইউনিটে সংখ্যা ৯০০টি।
- বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ মহিলা (নিউজ লেটার, ২০০২: ১৫)

প্রসংগত উলে-খ্য যে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সরকারি সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মোটামোটি দুটি স্ড়রে ভাগ করা যায়। এতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি সমাপ্তকরণ পর্যন্ড় পড়াশুনা করতে হয়। প্রাথমিক স্ড়র হতে ১৮ বছর এবং প্রাক-প্রাথমিক স্ড়র হতে ১৯ বছর পড়াশুনা করতে হয়। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে সরকারি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈতনিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম স্ড়র হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক স্ড়র। এস্ড়রের মেয়াদ এক বছর। ৫ বছর বয়সে এ স্ড়রে ভর্তি করতে হয়। এরপর রয়েছে ৫

বছর মেয়াদী প্রাথমিক স্ড়র। এ স্ড়রে ভর্তির ন্যূনতম বয়স ৬ বছর। পরবর্তী স্ড়র নিম্ন মাধ্যমিক যার মেয়াদ ৩ বছর। এরপর ৩ বছর মেয়াদী মাধ্যমিক স্ড়রে রয়েছে তিনটি বিষয়ভিত্তিক ডিপে-ামা গ্র"প যেমন: পেশাগত ডিপে-ামা, তাত্ত্বিক ডিপে-ামা ও কারিগরি ডিপে-ামা।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় স্ড়র, এখানে ডিপে-ামা-ধারীদের জন্যতিনটি গ্র"পে পড়ার সুযোগ রয়েছে। তা হচ্ছে চার বছর মেয়াদী স্নাতক কলা বা বিজ্ঞান বিভাগে ২ বছর মেয়াদী ইন্টিগ্রেটেড এসোসিয়েট ডিগ্রি। শেষোক্ত গ্র"পের কেবল কারিগরি ডিপে-ামাধারীরাই পড়তে পারে। আর প্রথম দুটি গ্র"প মূলত। তিন ধরনের ডিপে-ামা ধারীদের জন্যই উন্মুক্ত রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বে এক বছর মেয়াদী একটি মাধ্যমিকোত্তর কোর্সে পড়াশুনা করতে ও উত্তীর্ণ হতে হবে। এ কোর্সটি উচ্চ শিক্ষার কোনো স্বরূপে পরিগণিত হয় না। যেসব কারিগরি ডিপে-ামাধারী ইন্টিগ্রেটেড এসোসিয়েট ডিগ্রি নেবে তাদের এ কোর্স করতে হবে না। (নিউজ লেটার, ১৯৯৯ : ১৫)।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ড়রের তিনটি গ্র"পের যে কোনোটির স্নাতক ডিগ্রিধারী দুই বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর কলা বা বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে।

এবার আমরা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিসংখ্যানেরদিকে দৃষ্টি দেব। উলে- খ্য, বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাত্র শতকরা ৬ দশমিক ৭১ ভাগ। বাকি শতকরা ৯৩ দশমিক ২৯ ভাগ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিম্নোক্ত ছক থেকে এ পর্যায়ের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক দশকের একটি চিত্র পাওয়া যাবে:

ধরন	**শিক্ষা বর্ষ ১৯৮৮-৮৯**	**শিক্ষা বর্ষ ১৯৮৭-৯৮**	**শিক্ষা বর্ষ ১৯৯৮-৯৯**
প্রাক-প্রাথমিক			
শহরে ও গ্রামে	২, ৫৪৭	৬, ১১৪	৬, ১২০
শুধু গ্রামে	৫০৪	১, ১১১	১, ১৫০
প্রাথমিক			
শহরে ও গ্রামে	৫৪, ৪৩১	৬২, ৬৫৯	৬৪, ১৯২
শুধু গ্রামে	৪৩, ০৯৯	৪৩, ৪২৪	৪৬, ০৮৩
নিম্ন মাধ্যমিক			
শহরে ও গ্রামে	১৩, ৪০৫	২৬, ৬৯৭	২৭, ৪১৪
শুধু গ্রামে	৮, ২৩৪	১৩, ৩৫৭	১৩, ৯৫৮
উচ্চ মাধ্যমিক			
শহরে ও গ্রামে	৪, ৩৯৮	১৩, ১৫১	১৩, ৭৯০
শুধু গ্রামে	১, ১৪৭	২, ৮০৭	৩, ১০৯
মাধ্যমিকোত্তর			
শহরে ও গ্রামে	-	৭০১	১, ৭০৯

শুধু গ্রামে	-	১৩	৫৮
মোট			
শহরে ও গ্রামে	৭৪, ৭৮১	১০৬, ৬৫৮	১১৩, ২২৫
শুধু গ্রামে	৫২, ৯৮৪	৬০, ২২৩	৬৩, ৩৫৮

(নিউজ লেটার, ২০০২: ১৭)

উলি□খিত সারণির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৮৮-১৯৮৯ শিক্ষা বার্ষে প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা শতকরা ৫১ দশমিক ৪১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসময় এ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ছে শতকরা ৬২ ভাগ। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে একইসময় শিক্ষয়ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৭৯ দশমিক ৭৭ ভাগ। ফলে ১৯৮৮-১৯৮৯ শিক্ষাবর্ষে যেখানে মোট শিক্ষক শিক্ষায়ত্রীর মধ্যে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ছিলশতকরা ৪৪ দশমিক ৯ ভাগ সেখানে ১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষা বর্ষে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৯ দশমিক ৮৩ ভাগ।

বর্তমানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৬, ৪১, ০৩৭ জন, এদের মধ্যে শিক্ষিকার সংখ্যা ৩, ১৯, ৪১১ জন। নিম্নোক্ত ছক থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

স্কুলের ক্যাটাগরি	শিক্ষক-শিক্ষিকা	শিক্ষিকা
প্রাক-প্রাথমিক	৬, ৭৩২	৬, ৬০০
প্রাথমিক	৩, ১২, ৩০৮	১, ৬৮, ৬৯৮
নিম্ন মাধ্যমিক	১, ৭৯, ২৬৬	৮১, ৩৯১
উচ্চ মাধ্যমিক	৩, ৩৪, ৪৪৮	২৮, ৪৩১
মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষাপূর্ব	৮, ২৮৩	৪, ২৯১
মোট	৬, ৪১, ০৩৭	৩, ১৯, ৪১১

(নিউজ লেটার, ২০০২: ২১)

১৯৮৮-১৯৮৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে শুর" করে এক দশককালের মধ্যে দেশে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৮-১৯৮৯ শিক্ষাবর্ষে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২২, ০৪৪ জনে। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার শতকরা ২৩ দশমিক ৮৫ ভাগ। একইসময় প্রাথমিক স্ড়রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮২ লাখ ৬২ হাজার ৪৪১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪ লাখ ৬৩ হাজার ৫৪৭ জনে দাঁড়ায়। অর্থাৎ শতকরা ২ দশমিক ৪৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে নিম্নমাধ্যমিক স্ড়রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭ লাখ ২৪ হাজার ৬০৬ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৭২ জনে দাঁড়ায়। অর্থাৎ শতকরা ৯৪ দশমিক ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৭৩ হাজার ১৭ থেকে বেড়ে ১৯ লাখ ১৯ হাজার ৬২৬ জনে দাঁড়ায়। অর্থাৎ শতকরা ১৪ দশমিক ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

উচ্চ মাধ্যমিক স্ড়র পর্যন্ড় ১৯৮৮-১৯৮৯ শিক্ষা বছরে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এক কোটি ২৭ লাখ ৩৮ হাজার ৪৩ জন এবং মাধ্যমিকোত্তরসহ যা পরে মোট শতকরা ৪৩ দশমিক ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধির হার দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের প্রায় দেড়গুণ যা শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের অতুলনীয় সাফল্যের প্রমাণ বহন করছে।

এবার আমরা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সরকার পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিভাগদ্বয়ের শিক্ষার্থীদের বিষয়ের প্রতি সংক্ষেপে দৃষ্টিপাত করব। শিক্ষার্থীদের ১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষা বছরে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্ড়রে উক্ত দুই বিভাগে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল২ লাখ ৭৭ হাজার ৫৫৯ জন। এদের মধ্যে কলা শাস্ত্রে ১৬, ৯৬২ জন, কম্পিউটারে ২১, ১৮৬ জন, কৃষি ও পশু পালনে ৩, ৫৩৩ জন, শিল্পে ৩১, ১৫০ জন, শরীর চর্চায় ৩, ৫৯২ জন, স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ বিজ্ঞানে ১৯, ৮১১ জন, প্রকৌশলে ১ লাখ ৪ হাজার ৫০৪ জন, হিসাব রক্ষণ ও ব্যবসা প্রশাসনে ৪৬, ২৯৮ জন, অঙ্কন ও ভূগোল বিদ্যায় ১৬, ৬২৩ জন এবং অন্যান্য বিষয়ে ১৩, ৯০০ জন পড়াশুনা করেছিল। উচ্চ মাধ্যমিক স্ড়রে ছাত্রীদের হার শতকরা ৪৮ দশমিক ৩৯ ভাগ। তবে তাদের বেশির ভাগ উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে তাত্ত্বিক ডিপে-ামার জন্যপড়াশুনা করছিল। বৃত্তিমূলক ও কারিগরী বিভাগদ্বয়ে ছাত্রদের হার শতকরা ৭০ দশমিক ০৮ ভাগ এবং ছাত্রীদের হার শতকরা ২৯ দশমিক ০২ ভাগ।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে ১৯৯৮ শিক্ষা বছরে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুর“ করে মাধ্যমিকোত্তর (উচ্চ শিক্ষাপূর্ব) স্ড়র পর্যন্ড় মোট শিক্ষক শিক্ষিকাও শিক্ষার্থীদের অনুপাত ছিল ১: ২৮৭। এ অনুপাত প্রাক-প্রাথমিক স্ড়রে ১:৩২, প্রাথমিক স্ড়র ১: ৪৭ নিম্ন মাধ্যমিক স্ড়রে ১: ২৯.৫ উচ্চ মাধ্যমি স্ড়রে ১ঃ২৯ এবং মাধ্যমিকোত্তর (উচ্চ শিক্ষা পূর্ব) স্ড়র ১: ৪৪.২ (নিউজ লেটার, ২০০১: ১৫-১৯)

০৩। উচ্চতর শিক্ষা:

ইরানের গতিশীল সংস্কৃতি ও সভ্যতায় উচ্চতর শিক্ষার একটি সুপ্রাচীন অতীত ইতিহাস রয়েছে। সামানী শাসনকালে ২৪১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পরবর্তী কালেইরানের বিভিন্ন নগরীতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছিল। সেকালে চিকিৎসা ও চিকিৎসা শিক্ষার প্রতি গুর“ত্বারোপ, গ্রিক, ভারতীয় ও ইরানিদের অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক সাফল্যের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষ কয়েকটি নগরী প্রাচীনকালের উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

প্রাচীনকালে ইরানে সাধারণ শিক্ষা তথা মক্তব ও বিদ্যালয়, জামে মসজিদ, ক্লিনিক, ঔষধালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, দর্শন বিদ্যালয়, ও মানমন্দিরসমূহ এবং বড় শহরগুলোতে বিশেষভাবে উচ্চতর শিক্ষার সমন্বিত কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হত এবং এ সমস্ড় কেন্দ্রের উচ্চতর শিক্ষা ইসলামি ও ইরানি

সমাজে প্রয়োগ করা হত। Marragheh মান মন্দির, Zeejh মান মন্দির, Ologh – Beyh, Rob'e Rasheedi-এর মত গবেষণা কেন্দ্র, এমনকি ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে-এর সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সময় কাজার সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আমীর কবির ইরানে ১৮৪৮ সালে 'দার"ল ফুযুন' (হাউজ অব টেকনিক)-এর মত আধুনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। (নিউজ লেটার, ২০০১ : ১৫)

সে সময়ে বিদেশে ছাত্রদের প্রেরণ ও বিদেশি বক্তাদের ইরানে আমন্ত্রণ ছাড়াও তাবরিজ শহরে উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৪ সাল থেকে তেহরান, মাশাহদ, ইসফাহান, ও তাবারিজে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়। ১৯৬৭ সালে বিজ্ঞান ও উচ্চতর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্রকে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিন্ন কাঠামোগত রূপ দেয়া হয়।

১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ-বের বিজয়ের পর উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। মৌলিকভাবে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিপ-বের নতুন চাহিদা পুরণে উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও উচ্চতর শিক্ষামন্ত্রণালকে 'সাংস্কৃতি ও উচ্চতর শিক্ষা মন্ত্রণালয়' এ রূপান্ড়িত করা হয়। একই চেতানায় ও একটি বিপ-বী সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠারজন্য উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন মৌলিক ও ব্যবহারিক গবেষণায় নতুন মান

নির্ধারণ এবং বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিপ- বী সমাজের মূল্যবোধ ও জাতীয় জাগরণকে প্রাতিষ্ঠানিকী-করণের লক্ষ্যে বিপ- বের নেতা ইমাম খোমেনী (র.) কালচারাল রেভ্যুলেশন হেড কোয়ার্টার (সাংস্কৃতিক বিপ—ব সদর দফতর) প্রতিষ্ঠা করেন- যা পরবর্তীকালে 'সুপ্রীম কাউন্সিল অব কালচারাল রেভ্যুলেশন' (সাংস্কৃতিক বিপ- বের সর্বোচ্চ পরিষদ) নামে রূপান্ড়রিত করা হয়। এ প্রতিষ্ঠান দেশের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষানীতি প্রণয়নে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (নিউজ লেটার, ২০০১ : ১৬)

ইরানের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রধানত সরকারি ও বেসরকারি এ দুভাগে বিভক্ত করা যায়। শিক্ষ সংক্রান্ড় যাবতীয় বিষয় সংস্কৃতি ও উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্রভাবে উচ্চতর শিক্ষার শৃঙ্খলা ও তত্ত্বাবধান করে থাকে। শিক্ষা সংক্রান্ড় মূল্যায়ন সংস্থা সরকার পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠানের কিছু প্রার্থীকে পোস্ট-ডিপে—ামা, ব্যাচেলরস, মাস্টার্স অথবা ডক্টরাল (মেডিকেল) ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী পাবলিক প্রবেশিকা জাতীয় পরীক্ষার আয়োজন করে। উক্ত পরীক্ষায় পাশের পর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে তথা পশু চিকিৎসা, মানবিক শিক্ষা, মৌলিক বিজ্ঞান, কারিগরী ও প্রকৌশলী, কৃষি ও কলাবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বিশেষায়িত ডক্টরাল ডিগ্রি পিএইচডি কোর্সের জন্য প্রার্থী নির্বাচন মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরাসরি করে থাকে।

সংস্কৃতি ও উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৫৩টি সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধিভুক্ত রয়েছে। প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলো ও প্রধান প্রধান শহরে উচ্চ শিক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে 'পাইয়ামে নুর' নামক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতি কর্মকা" ত্বরান্বিত করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছে আর্ধবাসিক ও দূরশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা কর্মসূচির বাস্ড়বায়ন করা। যারা বঞ্চিত ও দূরাঞ্চলে বসবাস করে এবং শিক্ষার সুযোগ পায় না, সে সকল লোক, গৃহিনী ও কর্মচারীদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ প্রদানে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে ১৩০টি শাখার মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি দু'লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুবিধা দিচ্ছে। (নিউজ লেটার, ২০০১ : ১৮)।

১৯৯৬-১৯৯৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৬ লাখ, এদের মধ্যে ১৪.৭১% পোস্ট ডিপে-মা, ৭২.৩০% স্নাতক, ৪.৬৩% স্নাতকোত্তর, ৬.৮৮% মেডিকেল ডক্টরাল ও ১.৪৮% বিশেষায়িত ডক্টরাল পর্যায়ে লেখাপড়া

করছে। একই বছরে মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ছিল ৮৩, ৩৮৫ জন এবং পূর্ণাঙ্গ ও খ-কালীন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২৭, ৬৫০ জন (নিউজ লেটার, ২০০৩: ১৮-১৯)।

১৯৯৯-২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে ইরানের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৫২ জন। এর মধ্যে এক লাখ ২০ হাজার ৮১ জন হাই স্কুল পরবর্তী ডিপে-ামা স্তরে, ৪ লাখ ২৫ জন স্নাতক পর্যায়ে, ৩০ হাজার ৯৩ জন স্নাতকোত্তর পর্যায়ে, ৩৬ হাজার ৯০৬ জন পেশাগত ডক্টরেট পর্যায়ে এবং ১০ হাজার ৫৭৪ জন পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান কেন্দ্রসমূহে পূর্ণকালীন শিক্ষকের সংখ্যা ২১ হাজার ৫ জন।

বর্তমানে ইরানের বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫২টি, স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও চিকিৎসা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৩টি, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৫৫টি এবং মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারাধীন ও অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রর সংখ্যা ২৯টি। ইরানে মোট গবেষণা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৮৭টি। এর মধ্যে ৬৯টি বিজ্ঞান, গবেষণা ওপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে, ১৫টি স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং ১০৩টি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থার স্বীকৃতি অনুমোদন প্রাপ্ত। (নিউজ লেটার, ২০০৩: ৩৮-১৯)।

বিপ-ব পরবর্তীকালে উচ্চতর শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপূরক হিসেবে এবং সমাজের বৈজ্ঞানিক মাত্রার মূল্যায়নের জন্যসংস্কৃতি ও উচ্চতর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অলাভজনক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬, ৫০, ০০০ জন।

ইরানি শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চতর শিক্ষা সুবিধার পাশাপাশি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে বর্তমানে ৪২ টিরও বেশি দেশের শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করছে। সংস্কৃতি ও উচ্চতর শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্যান্য দেশ থেকে সকল বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের জন্য আরো অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছে। এ মন্ত্রণালয় বিশ্বের সকল দেশে ইরানি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খুলতে, ফারসি ভাষা সংক্রান্ড় আসন প্রতিষ্ঠায় ও ফারসি ভাষার ভিজিটিং শিক্ষক প্রেরণে প্রস্তুত রয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় আবিষ্কার উদ্ভাবক ও গবেষকদের সহায়তা প্রদান এবং স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অন্যান্য মেধাবী ও সৃজনশীল ব্যক্তিকে উৎসাহিত করার জন্য ১৯৮৭ সাল থেকে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে খারোজমি উৎসব পালিত হয়ে থাকে। আবু আব্দুল-াহ মুহাম্মদ বিন মুসা খারেজেমি (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) ছিলেন ইসলামি যুগের একজন প্রখ্যাত প-িত ও রসায়নবিদ। তাঁর নামেই এ

প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে-যার মাধ্যমে খ্যাতনামা মনীষীদের পুরস্কৃত করা হয়। জুরিদের একটি কমিটি শ্রেষ্ঠ আবিস্কারক, উদ্ভাবক, ও গবেষকদের বাছাই করে থাকে এবং একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট তাদের পুরস্কৃত করেন। সংস্কৃতি ও উচ্চতর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্বের সকল দেশের প্রার্থীদের স্বাগত জানিয়ে থাকে। (নিউজ লেটার, ২০০৩ : ৩৮)।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান প্রতি বছর আগস্টমাসে বিশ্ববিদ্যালয়য়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামি বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি, ফারসি ভাষাও সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও অঙ্কশাস্ত্রের উপর একটি আন্ড়র্জাতিক সাইন্স অলিম্পিয়াডের আয়োজন করে থাকে। উলি- খিত বিষয়গুলোর উপর সমগ্র বিশ্ব থেকে অত্যন্ড় মেধাবী শিক্ষার্থীদের এ অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সংস্কৃতি ও উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো), তৃতীয় বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সংস্থাসমূহের নেটওয়ার্কের নির্বাহী পরিষদ (Third World Network of Scientific Organizaion) তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান একাডেমি (Third World Academic of Science), বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি সংস্থার স্থায়ী কমিটি, দক্ষিণাঞ্চলের স্থিতিশীল উন্নয়ন সংক্রান্ড় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটির সদস্য ও এ আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সংশি—ষ্ট মন্ত্রণালয় অন্যান্য দেশর সাথে সকল ধরনের সহযোহিতা সম্প্রসারণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে (নিউজ লেটার, ২০০৩: ২৮)।

Dhaka University Institutional Repository

০৪। স্বাস্থ্যঃ

স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যেস্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৫-৯৬ সালের মধ্যে বেশ কিছু কর্মকা সম্পাদান করে। এসব কর্মকাের মধ্যে প্রধান প্রধান দিকগুলো হল এক হাজার ৬৭টি স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ১৮১ টি নগর ও গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ৮১টি চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ২৫টি সন্ড্রান প্রসবকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ২০০টি প্রসূতি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, এক হাজার গ্রামীণ ধাত্রী এবং দুই হাজার মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টকে প্রশিক্ষণ দান, এক বছরের কমবয়সী শতকরা ৮৫টি শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিতকরণ এবং ১৯৯৪ সালের প্রথম দিকের মধ্যে (দুই পর্যায়ে এক কোটি ৮২ লাখ অনুর্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুকে টিকা দিয়ে) দেশকে পোলিও রোগমুক্ত করণের একটি জাতীয় পরিকলল্পনা বাস্ড়বায়ন, এছাড়া ১৯৯৮ সালে স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৬ হাজারে এবং গ্রামীণ ও নগরস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা যথাক্রমে ২, ৩২০ ও ২, ০০৬ টিতে উন্নীত হয়। ১৯৭৮ সালে ইরানে শিশু মৃত্যুর হার ছিলপ্রতি হাজারে ১২০ আর ১৯৯৮ সালে তা কমে প্রতি হাজারে ২৬ এ দাঁড়ায়। ইসলামি বিপ- বোত্তর নতুনযুগে এসে দেশের শতকরা ৯১ ভাগ গ্রামীণ পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানির সুবিধা ভোগ করে থাকে- যা সংক্রামক ও ক্ষতিকর রোগ প্রতিরোধে একটি ইতিবাচক প্রভাব রেখে চলেছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের মধ্যে রয়েছে- ২২টি হাসপাতাল উদ্বোধন ও সুসজ্জিতকরণ এবং জর"রি, ছোঁয়াচে, আইগিণউ, সিগিণউ, চক্ষু, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি ও রেডিওগ্রাফিসহ ৪০টি নতুন ওর্য়াড প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ৪০টি ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি ১৪টি জর"রি চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ২১টি পলিক্লিনিক স্থাপন করেছে। বর্তমানে সারাদেশে মোট হাসপাতালের সংখ্যা ৮২ হাজার। চিকিৎসা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনেও উলে- খযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এসব সাফল্যের মধ্যে আছে অপারেশন র"মের জন্য মান সম্মত বেড, সার্জারি সেলাইর সুতা, ডিসপোজেবল গে-াভস ও সিরিঞ্জের ব্যাপক উৎপাদন এবংএর উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ফলে এখন তা রফতানিও করা হচ্ছে। ঔষধ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ইরানের ৫৭টি ঔষুধ উৎপাদন কারখানার আমদানি করা কাঁচামাল ব্যবহার করে প্রয়োজনের শতকরা সাড়ে ৯৬ ভাগ বিভিন্ন ধরনের ঔষধ উৎপাদন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরির্চযা ও চিকিৎসা উন্নয়নে আরেকটি কার্যকর পদক্ষেপ হচ্ছে সমগ্র দেশের সকল নাগরিককে পাবলিক হেলথ ইন্স্যুরেন্স-এর আওতায় আনা। মেডিকেল প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরেপর্যাপ্ত কর্মকা" সম্পাদন করেছে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ড় ইরানের প্রতিটি প্রদেশে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সক্রিয়ভাবে চালুছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৩৩টি আর মেডিকেল কলেজের সংখ্যা হয়

৬টি। দেশে চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে চিকিৎসা ও নার্সিং কোর্সের সুবিধা সম্বলিত ৮টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেই সাথে চিকিৎসকদেরজন্য ৭টি কোর্স, ৮টি বিশেষ কোর্স ও একটি উচ্চতর বিশেষ কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একাডেমিক স্টাফের সংখ্যা ৮ হাজার ৪০০ জন। ১৯৮৮ সালেচিকিৎসা শাস্ত্রে পোস্ট পিএইচডি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল১৫ জন আর ১৯৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭০ জনে উন্নীত হয়েছে। একইসময়ে পিএইচডিশিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২২৯ঃ। এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ১৯৮৮ সালে মেডিকেল সহকারীর সংখ্যা যেখানে ছিল ১৭১১ জন সেখানে ১৯৯৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়ায় ৫ হাজার ৫৫৫ জনে। এসবের মধ্যে শতকরা ৪৪ ভাগ মহিলা। (নিউজ লেটার, ২০০২: ১৩-১৪)।

৫। নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতি:

ইসলামি বিপ-ব সফল হওয়ার পরে বিশেষত দ্বিতীয় দশকে ইরান ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তিতে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণার্থে বিশেষ ভূমিকা। ফলে এক্ষেত্রে একটি উলে-খযোগ্য সাফল্য লক্ষ করা যায়। অথচ মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৬ সালে ইরানে মহিলাদের সংখ্যা ছিলএক কোটি ৬৪ লাখ আর ১৯৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২ কোটি ৯৫

লাখ অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির সূচক উলে- খযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হল: (নিউজ লেটার, ২০০২: ১৪)

(ক) স্বাক্ষরতা:

ইসলামি বিপ- বের আগে ১৯৭৬ সালে ইরানে নারী শিক্ষার হার ছিলমাত্র শতকরা ৩৫.৫ ভাগ। এসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৬ সালে হয় শতকরা ৫২ ভাগ। আর ১৯৯৮ সালে হয় শতকরা ৭৫ ভাগ। অর্থাৎ দেশটির বিপ- বের পর নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩০০ ভাগ। স্বাক্ষরতার হার গ্রামাঞ্চলেওঅত্যন্ড় বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ মহিলাদের মাঝে স্বাক্ষরাতর হার ছিল১৭ দশমিক ৩ ভাগ আর ১৯৯৮ সালে তা হয়েছে শতকরা ৬৩ ভাগ। পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৭৬ সালও ১৯৮৬ সাল পর্যন্ড় স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যায়নরত মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ১৭ ভাগ থেকে ১৮ ভাগ। প্রতিরোধক ব্যবস্থাগুলো প্রত্যাহার করার ফলে মহিলাদের মাঝে শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে এ হার শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ইসলামি বিপ- ব পরবর্তী দ্বিতীয় দশকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রীদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৬ সালে কেবলমাত্র গৃহবধু হিসেবে জীবন-যাপনকারী মহিলাদের সংখ্যা যেখানে ছিলশতকরা ৯৭ ভাগ সেখানে ১৯৯৬ সালে এসে তা কমে আসে শতকরা ৬৫ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৮৬ সালে

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রীদের সংখ্যা ছিলশতকরা ১ দশমিক ২ ভাগ। এসংখ্যা শতকরা আরো সাড়ে তিন ভাগ বেড়ে ১৯৯৬ সালে হয় শতকরা ৪ দশমিক ৩ ভাগ। (নিউজ লেটার, ২০০২: ১৪)

(খ) শিক্ষা:

যদিও স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি একটি দেশের উন্নয়নের পথ প্রশস্ড় করে তা সত্ত্বে ও শিক্ষার মানও এ ক্ষেত্রে একটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৮৬ ও ১৯৯৭-এর পরিসংখ্যান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি ইরানে শিক্ষার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক বা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা অর্জনকারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং অধিক সংখ্যক নারী এখন উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ড় শিক্ষা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। (নিউজ লেটার, ২০০২: ১৪)

(গ) কর্মসংস্থান:

ইরানে মহিলাদের মাঝে বেকারত্বের হার ১৯৭৬ সালের শতকরা ১৬ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৮৬ সালের যুদ্ধকালীন সময়ে শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত হয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে তা শতকরা ১৩ ভাগে কমে আসে। নগরাঞ্চলে নারীদের বেকারত্বের হার ১৯৭৬ সালের শতকরা ৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৬ সালে শতকরা ২৯ ভাগে উন্নীত হয়। চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধও মিল-কারখানা ধ্বংস এবং শিল্প খাতে স্থবিরতাএর কারণ হিসেবে কাজ করে। গ্রামীণ

মহিলাদের মাঝে বেকারত্ব১১৭৬ সালে যেখানে ছিলশতকরা ২২ ভাগ। সেখানে ১৯৮৬ সালে এসে তা দাঁড়ায় শতকরা ২১ ভাগ। যুদ্ধের কারণে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের উপর উলে- খযোগ্য কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। ১৯৯৬ সালে তাদের বেকারত্বের হার কমে শতকরা ১৪ ভাগ নেমে আসে। নগরাঞ্চলে মহিলারা কাজ করে প্রধানত কৃষি ও হস্ড্রশিল্প খাতে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ড় ইরানি মহিলাদের শতকরা প্রায় ৪৬ ভাগ কার করে সেবামূলক চাকরী ক্ষেত্রে, শতকরা ৩৪ দশমিক ৫ ভাগ শিল্প খাতে এবং শতকরা ১৭ ভাগ কৃষি খাতে কাজ করেছে।

মহিলা কর্মসংস্থানের বর্তমান পরিস্থিতি তাদের অস্থা নিম্নপর্যায় থেকে মাঝারী পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার এক সুস্পস্ট ইঙ্গিত বহন করে। ১৯৭৬ সালে শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ মহিলা বিশেষ মর্যাদাবান কর্মে নিয়োজিত ছিল আর ১৯৯৬ সালে তা শতকরা ২৮ ভাগে উন্নীত হয়। কল-কারখানায় কর্মরত মহিলাদের সংখ্যা ১৯৭৬ সালে ছিলশতকরা ৫৩ ভাগ কিন্তু বর্তমানে তা শতকরা ২৩ ভাগে নেমে এসেছে এবং ১৯৯৬ সালে এসে শতকরা মাত্র ৪ ভাগ মহিলা নিম্নপর্যায়ের শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল। (নিউজ লেটার, ২০০২ : ১৫)।

(ঘ) স্বাস্থ্যঃ

পুর"ষদের তুলনায় মহিলাদের গড় আয়ু সবসময় বেশি এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা আরো বেশি হয়েছে। ১৯৮৩ সালে মহিলাদের গড় আয়ু ছিলপ্রায় ৬০ বছর আর ১৯৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮ বছর হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এ প্রবণতার প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে। শহরাঞ্চলে মহিলাদের জীবনের গড় আয়ু ১৯৯৬ সালে ৭০ বছর পর্যন্ড় পৌঁছেছে। ১৯৮৬ সালে শহরে মহিলাদের গড় আয়ু ছিল ৬৫ বছর আর গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের গড় আয়ু ৫৬ বছর থেকে ৬৮ তে উন্নীত হয়েছে। (নিউজ লেটার, ২০০২: ১৫)

(ঙ) বিবাহঃ

ইসলামি বিপ-বোত্তর দ্বিতীয় দশকে ইরানি বৈবাহিক হারও ঊর্দ্ধমুখী হয়েছে। ১৯৮৬ সালে প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে গড়ে মাত্র ৭ জন বিবাহ বন্দনে আবদ্ধ হত। ১৯৯৬ সালে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি হাজারে ৮জন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তালাকের বিবাহ বিচ্ছেদের হার গত কয়েক বছরে সামান্য কিছু বেড়েছে। তবে ১৯৮৬ সালের তুলনায় ১৯৯৭ সালে তা ছিলকম। ১৯৯৬ সালে প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে ৬ জনের দাম্পত্য জীবনে তালাক সংঘটিত হয়। পূর্বে বিবাহ ওতালাকের আনুপাতিক হার ছিল শতকরা ৮ ভাগ। এ হার ১৯৮৬ সালে ছিল শতকরা ১০ ভাগ আর ১৯৯৩ সালে ছিল শতকরা ৬

ভাগ। ১৯৮৬ সালে এ হার বৃদ্ধির কারণকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধেরপ্রভাব বলে মনে হকরা হয় (নিউজ লেটার, ২০০২: ১৫)

(চ) কর্মজীবী মহিলাদের প্রধান গ্রুপঃ

বিশ্ব জনগোষ্ঠীর অর্ধেক মহিলা হলেও উন্নয়ণেরমূলে তাদের অংশীদারিত্ব খুবই সামান্য। যেহেতু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মহিলারা স্বল্প পারিশ্রমিক নিয়ে আনানুষ্ঠানিকভাবে বা তাদের স্বামীর সাথে কাজ করে থাকে, তাই তাদের পদ-পদবীও হয় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্ড়রের। ইসলামি বিপ□ব পরবর্তী কালের দু'দশকে ইরান মহিলাদের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এক উলে-খযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছে। সৌভাগ্যক্রমে সেই সাথে গত কয়েকবছরে সরকার মহিলাদের সহায়তায় এবং সেই সাথে তাদের অংশীদারিত্বের প্রশ্নে অধিকহারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

এর তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষিত কর্মজীবী পুর"ষদের তুলনায় শিক্ষিত মহিলা কর্মজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৬ সালে মহিলাদেরএই বর্ধিত হার ছিলএক দশমিক পাঁচ ভাগ যদিও দেশের মোট জনসংখ্যায় শিক্ষিত পুর"ষদের তুলনায় শিক্ষিত মহিলাদের শতকরা হার কম। এর অর্থ, সমতাপূর্ণ অবস্থায় পুর"ষরা-কিংবা নারী উন্নততর কর্ম প্রাপ্তির সুবিধা ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ মহিলারা কেবল তখনই উন্নততর কর্ম সংস্থান পেতে পারেযখন তারা

পুর"ষদের তুলনায় অধিকতর শিক্ষিত ও অধিকতর প্রতিভার প্রমাণদিতে পারবে। (নিউজ লেটার, ২০০২ : ১৫)

(ছ) চলচ্চিত্র শিল্পে মহিলা:

শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যমের ন্যায় চলচ্চিত্র শিল্পেও ইরানি নারীদের দক্ষ তৎপরতা প্রশংসার দাবি রাখে। ইসলামি বিপ-বের পর ইরানে বেশ কয়েকটি মহিলা চলচ্চিত্র নির্মাতার আবির্ভাব ঘটে। বিশেষ করে ৯ জন মহিলা চলচ্চিত্র নির্মাতার ভূমিকা সবিশেষ উলে-খযোগ্য। ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে ইরানি চলচ্চিত্রের সংস্কার সাধনে তারা গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এখানে অবশ্য শর্ট ফিল্ম ও ডুকেমেন্টরি ছবি নির্মাতাদের কথা আমরা আলোচনা করব। তারা হলেন: মিস পৌরান দেরাখমান্দে। তিনি দুটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করেন। এগুলো হল *Fibres* এবং *plague* ছবি দুটিতে বিপ-বের আগে ইরানের এই মহামারী রোগটির প্রাদুর্ভাবকে তুলে ধরা হয়েছে। তার প্রথম ফিচার ছবি *The rute connection*। ১৯৮৬ সালে এটি নির্মিত। *The little Bird of hapiness* (সুখের ছোট্র পাখি) নামক তার দ্বিতীয় ছবিটি ১৯৮৮ সালে নির্মিত হয়। তার তৃতীয় ছবি *Passing Through The Mist* (কুয়াশায় ভ্রমণ) নির্মিত হয় ১৯৯০ সালে। তার শেষ ছবিছিল The Lost Time হারানো সময়।

রাখশান বনি এ'তেমাদ তাঁদের পাঁচটি ফিচারধর্মী চলচ্চিত্র রয়েছে। সেগুলো হল *Off the limit* (সীমানা পেরিয়ে) ১৯৮৮, *Canary Yellow*

*(*ক্যানারি হলুদ) ১৯৮৯, *Foreign currency* ১৯৯০, নার্গিস-১৯৯২ নীলাভ পর্দা১৯৯৪ ইত্যাদি। তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের আগে টেলিভিশনের জন্য বেশ কয়েকটি শর্ট ফিল্ম তৈরী করনে। সেগুলো হল: *যুদ্ধের অর্থনৈতিক কৌশল, যায়াবাদের আগমন, ভোগবাদী সংস্কৃতি, পল□ী অভিবাসী, শহরের পেশা, কেন্ডারায়ন* প্রভৃতি।

মিসেস তাহমিনা আরদাকানি হলেন আরেকজন চলচ্চিত্র নির্মাতা, যিনি মাত্র একটি ছবি নির্মাণ করেছেন ১৯৮৬ সালে। ছবিটির নাম *গুলবাহার*। একটি পঙ্গু বালিকার আবেগ প্রবণতা এই ছবিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মিসেস তাহমিনা মিলা নির্মিত কয়েকটি ছবি হল *লাল রেখা, যুদ্ধের বার্তাবাহক, লবনাক্ত হৃদয়* এবং *হে ইরান*। পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম ছবি হল *তালাকের সন্ড়ন*। তাঁর অন্যান্য ছবি হল*আহ-এর কিংবদন্ড়ী, কি এমন নতুন* প্রভৃতি।

মিসেস ফারিয়াল বেহযাদ ইনি একজন শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতা। শিশু বিষয়ক তার দু'টি চলচ্চিত্রের নাম হল*কাকোলি* ও *প্রজাপতির উপত্যকা*।

অপর আরেকজন ফিল্ম নির্মাতা মিসেস জাহারা মাহাস্ড়িবাদি তাঁর প্রথম ফিচারধর্মী ছবির নামহল: *হাসনাকবটি*-১৯৯২ সালে নির্মিত হয়।

মিস মারজিয়েহ বারোমান্দ যিনিশিশুদের জন্য পাপেট ফিল্ম তৈরী করেন। তিনি বিখ্যাত *ইদুঁরের শহর* ছবির পরিচালক ছিলেন। ১৯৯৩ সালে

তিনি *Ziba Barber Shop* নামক এক টিভি সিরিয়াল পরিচালনা করেন। তার দ্বিতীয় ছবি ছিল *হ্যালো আমি একটি মুরগি।*

মিসেস নাফিসেহরিয়াহি তিনি এনিমেশন ছবি তৈরি করে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি যেসব ছবি পরিচালনা করেছেন সেগুলো হলকতটুকু *আমিজানি*, *রংধনু*, *গোলাপি ফ্রেয়ন*, *রক্ত*, *তেহরানথেকেতেহরান*, *সাত অভিযান*প্রভৃতি। *বিড়াল* ও *মালেক জামশিদ* নামে দুটি এনিমেশন ছবিরও তিনি পরিচালনা করেন।

মিস ইয়াসমিন মালেক নাসর, তিনি *সারা*নামক ছবিতে অভিনয় করেন। অভিনয়ের জন্যতিনি ১২তম ফজরফিল্ম ফেস্টিভালে পুরস্কার লাভ করেন। তিনি *সাধারণ দুরবস্থা* ছবির পরিচালক হিসাবে চলচ্চিত্রে এগিয়ে আসেন।

পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ছাড়া অনেক ইরানি মহিলা চলচ্চিত্রের জন্যচিত্রনাট্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। এরকম একজন হলেন এনমিয়া শাহ হোসাইনি। তিনি *পানি ঘোলা করো না*, *লবণাক্ত*, *হৃদয়*, *আঙ্গিকার* প্রভৃতিছবির চিত্রনাট্য রচনা করেন। তাঁর সর্বশেষ ছবির নাম হল*পৌরিয়া ই ওয়ালি (Pouria-E-Wali)*

১৯৯৫ সালে লোকারনো আন্ড়র্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ইরানের মহিলা চিত্র নির্মাতাদের চলচ্চিত্র প্রশংসা অর্জন করে। (নিউজ লেটার, ২০০২ : ৪৩)

৬। ধর্মীয় সংখ্যালঘু:

ইরান ইসলামি বিপ□ব সাফল্যমন্ডিত হওয়ার পর সামাজে ইসলামি নীতিও বিধান বাস্ড়বায়নের বিষয়টিকে অত্যন্ড় গুর"ত্বর সাথে অনুসরণ করে চলেছে। ইসলামের গুর"ত্বপূর্ণ নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে, একটি প্রত্যাশিত আচরণ বজায় রাখা, ইসলামি ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের চর্চা বজায় রাখা এবং অমুসলিমদের মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রর্দশন করা ইত্যাদি সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি এ জন্য করা হয়েছে যে, ইরানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনধারা অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় উলে- খযোগ্যভাবে আলাদা। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩-তে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের (জোরাষ্ট্রিয়ান, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান) ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন, ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হওয়াসহ সার্বিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৪ অনুসারে উপরিউক্ত সংখ্যালঘুদের প্রত্যেকের পার্লামেন্টে নিজস্ব প্রতিনিধি আছে, সেখানে প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ ধর্মীয়গ্রন্থ নিয়ে শপথ গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া সংবিধানের ১৯ ও ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল নাগরিকের প্রতি পরিপূর্ণ সহায়তার কথা বলা হয়েছে।

ইরানি সংবিধানের ঐসব অনুচ্ছেদ ও ধারা বাস্ড়বায়নের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে অবাধে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন এবং সমগ্র বিশ্ব থেকে স্বধর্মীয়দের যোগাদানসহ আন্ড়র্জাতিক সমাবেশ অনুষ্ঠান। এ রকম একটি উদাহরণ হচ্ছে তেহরানে জোরস্ট্রিয়ানদের আন্ড়র্জাতিক কংগ্রেস।

ইরানের সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রার্থনা স্থল, স্কুল, খেলার জায়গা, সমিতি সংগঠন, দাতব্য তহবিল ও প্রকাশনা রয়েছে। (নিউজ লেটার, ২০০২ : ১৫)।

(ii) ইরানের সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনঃ

ইসলামি বিপ-ব ইরানে পরিবর্তনের একব্যাপকতর প্রেক্ষাপট রচনা করে। এসব পরিবর্তনের মধ্যে একটি হল সংস্কৃতিতে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন। ইসলামি বিপ-বের আগে তদানীন্ড়ন শাসগোষ্ঠীরনির্দেশনা মোতাবেক ইরানি সমাজ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের মধ্যে তাদের পরিচিতি সন্ধান করত। সত্যিকার অর্থে এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ইরানিদের নতুন প্রজন্মের সামনে যে পরিচিতি তুলে ধরা হয়, তা কোনো বস্তুনিষ্ঠ পরিচিতি ছিলনা। ইরানি সংস্কৃতি থেকে ধর্মীয় ভাবধারা ঐতিহ্য ও পরিচিতিকে পৃথক করে ফেলতে অতীতের শাসকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক তত্ত্ববিদরা যে প্রচেষ্টা চালায় তা সাংস্কৃতিক বস্তুনিষ্ঠতা বর্জনের রূপ নেয়। অবশ্য ইসলামি বিপ—ব সফল হওয়ার পর যাবতীয় অপসংস্কৃতির চাপ দূরীভূত হয়। ইরানি জাতিসত্তা বিভিন্নভাবে তাদের ধর্মীয় চর্চার সুযোগ লাভ করে এবং ইরানি সমাজ তাদের ইসলামি পরিচিতি পুনর"দ্ধার করে। (নিউজ লেটার, ২০০২ : ২৪)

১। সংবাদপত্রঃ

ইরানের ইসলামি বিপ-ব বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের জন্য আশাবাদেরক্ষেত্র রচনা করেছে। বিপ-বের পর দেশটির ইতিহাসে প্রথমবারের মত সংবাদপত্র বিষয়ক কর্মকাে এক বিস্ময়কর ঘটনা পরিলক্ষিত হয়-যা অতীতের ঐতিহাসিক প্রবণতার সাথে অসাদৃশ। বিপ-বের অব্যবহিতপর ১৯৭৯ সালে ২২৫টি নতুন পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ১৯৯১ সালে আরও ১১৯টি পত্রিকাও প্রকাশনা শুর হয়। ইরানের মোট সাময়িকী ও সংবাদপত্রের শতকরা চলি-শ ভাগ প্রকাশিত হয়েছে ইরাক কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধকালে আর শতকরা ৬০ ভাগ প্রকাশিত হয় ইসলামি বিপ-বের পর।

বর্তমানে ইরানে শতাধিক পত্রিকা ওসাময়িকী প্রকাশিত হয় এবংএর প্রচার সংখ্যা ৪৮ কোটির মধ্যে শতকরা ৩১ দশমিক ৯ ভাগ অর্থাৎ ১৬৪টি পত্রিকা প্রকাশিত হয় অন্যান্য শহর থেকে। ১৭টি পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয় স্থানীয় সম্প্রদায়গত ও সংখ্যালঘুদের ভাষায়। এছাড়া আসিরীয়, আর্মেনীয় ও উর্দ ভাষায় ১১টি পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়। আড়াই শতাধিক অর্থাৎ শতকরা ৪৭ দশমিক ৬ ভাগ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে।

ইরানের সংবাদ পত্রগুলোর মোট ১৮টি জাতীয় ও১০টি হলো স্থানীয় পর্যায়ের। এইগুলো মোট প্রচার সংখ্যা ১৫ লক্ষাধিক এবং ভাষাহচ্ছে ফারসি

তুর্কি, আর্মেনীয়, আরবিও ইংরেজি। ইরানের ১৫ বছরের অধিক বয়সের প্রতি এক হাজার লোকের জন্য ৪২ কপির অধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় যা- অধিকাংশ দেশের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন: পাকিস্ড়ানে প্রতি এক হাজার নাগরিকের জন্য১৫ কপি, মারক্কোয় ১৩ কপি, ইন্দোনেশিয়ায় ২৮ কপি, চীনে ৩৭ কপি ও ভারতে ২৬ কপি পত্রিকার ব্যবস্থা রয়েছে। (নিউজ লেটার, ২০০২ : ২৪-২৫)।

২। রেডিও-টেলিভিশন:

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থা মনে করে যে, রেডিও-টেলিভিশনের ন্যায় অন্যান্য মিডিয়ার উচিৎ দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির উপযুক্ত নতুন নীতি গ্রহণ করা। ইসলামি বিপ- বের মহান নেতা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এই সংস্থার কর্তব্য হল সমাজের সাংস্কৃতির পরিবেশকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে করে একদিকে সৃষ্টিশীলতা, সাধারণ অগ্রগতি ও উন্নয়নমূলক কর্মকা" গতি লাভ করে এবং অপরদিকে ইসলামি বিপ- বের নীতি ও ইসলামের মূল ভিত্তি আরও বলিষ্ঠতা লাভ করে। বিশ্বের অশুভ শক্তির অপপ্রচার মোকাবিলায় প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলামি বিপ–বীবের মৌলনীতি সমুন্নত করা এবং সেইসাথে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও বিভাগসমূহের কর্মপ্রচেষ্টা তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে হবে। এসব শর্ত ও নিদের্শ কার্যকর করতে বিপ- বের পর টিভি চ্যানেলের সংখ্যা দু থেকে থেকে চারে উন্নীত করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইরানে রেডিও বিভিন্ন প্রাদেশিক চ্যানেল এবং তৎসংশি- ষ্ট পর্যায় রেডিও নেটওয়ার্ক ও বহির্বিশ্ব কার্যক্রম এবংসেই সাথে দু'টি টিভি স্টুডিও এবং ১৫টি রেডিও স্টুডিওর মাধ্যমে সবমোর্ট ১৭টি ভাষায় ইসলামি সংস্কৃতি সমুন্নত করার চেষ্টা চালায়। (নিউজ লেটার, ২০০২ : ২৫)

ইসলামি বিপ- ব পরবর্তীকালেরেডিও টেলিভিশন খাতে অগ্রগতির একটি প্রমাণ হল, মাধ্যম দু'টির কার্যক্রমের ক্রমবিস্ড়ার। ১৯৯৩ সালে রেডিও-টিভির জনসংখ্যা কার্যক্রম শতকরা ৯০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া তারা আন্ড়ঃ স্যাটেলাইট সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। বর্তমানে ইরানের ইলেকট্রনিক মিডিয়া বহুদূর এগিয়ে গেছে।

৩। বই ও বইমেলাঃ

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে সর্বসাধারণের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং একটি সংস্কৃতিবান জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বইপুস্ড়ক প্রকাশ ও বইমেলা আয়োজনের জন্য সরকারি খাতে বেশ কিছু কার্যকর ও সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালে ৪ কোটি ৮৫ লাখ কপি বই প্রকাশিত হয়। আর ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় ৬ কোটি ১০ লাখ কপি বই। পাবলিক লাইব্রেরিগুলো থেকে পাঠ গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দেড় কোটি, যদিও ১৯৮৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬০ লাখ।

বই মেলাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিকাশের এক উলে- খযোগ্য পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করা যায়। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান বিভিন্ন সময় বড় বড় বইমেলার আয়োজন করে থাকে যাতে, দেশি-বিদেশি প্রকাশকরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

আন্ড়র্জাতিক বইমেলা সম্পর্কিত সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতিদিন ঐসব মেলায় গড়ে প্রায় দুলাখ বইপ্রেমিক মেলা দেখতে যায় এবং মেলায় চার হাজারের অধিক প্রকাশক অংশগ্রহণ করে এবং হাজার হাজার বই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া বই সপ্তাহ উপলক্ষে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ বিজ্ঞান কেন্দ্র ও বিজ্ঞান লাইব্রেরিগুলো বইমেলার আয়োজন করে থাকে এবং সেগুলোতে হাজার হাজার বইয়ের প্রর্দশনী করা হয়। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে প্রতিবছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশিত বইয়ের মধ্য থেকে সেরা বই নির্বাচনের একটি উদ্যোগ রয়েছে। বছরের সেরা বই নির্বাচনের সর্বশেষ দফায় ২০জন মহিলা লেখক ও অনুবাদককে বাছাই করা হয়।

পুস্ড়ক ও পত্রিকা লেখা, প্রকাশনা ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে বিপ- বের পর থেকে এ যাবৎকাল ইরান উলে- খযোগ্য অগ্রগতি অজর্ন করেছে। ১৯৮০ সালের গ্রীষ্মে ইরানে ১৮৪ টি নয়া প্রকাশনা মুদ্রিত হয়। এর মধ্য ১০৫ টিই মুদ্রিত হয়েছে তেহরানে। এর মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও সরকারি সংস্থার বুলেটিন বা প্রকাশনা ধরা হয়নি। বিভিন্ন বিষয় বিশেষকরে বিপ- বী ও আদর্শগত বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে। অনুরূপভাবে বেড়েছে

তর"ণ ও যুবক পাঠকের সংখ্যা। বিপ- বী ও আদর্শগত বিষয় শিক্ষাদানের ক্লাসের সংখ্যা শহরাঞ্চল, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে উলে- খযোগ্যভাবে বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে এসব ব্যবস্থা ও আন্দোলন ইরানি জনগণ, বিশেষত যুবকদের মানসিক বিকাশ, আদর্শগত ও রাজনৈতিক অনুধাবন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর সহায়তা দিয়েছে। (নিউজ লেটার, ২০০২ : ২৭)।

৪। চলচ্চিত্র নির্মাণঃ

ইরানের ইসলামি বিপ- বের পর শিল্প ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়। স্বাধিনতা ও ইসলামি মূল্যবোধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সকলে দেশের উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুব সমাজের কল্যাণে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও সংস্কৃতির পুনর"জ্জীবন ঘটে। এ অগ্রগতির উলে- খযোগ্য দিক হলচলচ্চিত্র শিল্পকে নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা ও জনগণকে সুস্থ বিনোদন পরিবেশনের জন্য গঠনমূলক বাহনে পরিণত করা হয়েছে। বিগত দু'দশকে আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে ইরানি চলচ্চিত্রযে পুরস্কার লাভ করেছে এবং টিভি সিরিজ দেশে যেভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তাতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে গণসংযোগেরএ মাধ্যমটি সুষ্ঠুভাবেই অগ্রসর হচ্ছে।

সিনেমাশিল্প প্রসঙ্গে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের স্থাপতির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুর"ত্ব আরোপ করেছিলেন। ইমাম খোমেনী (র.) পাহলভি স্বৈরাশাসক মোহাম্মদ রেজাশাহ-এর দুর্নীতির বির"দ্ধে

প্রদত্ত ভাষণে বলেন, ঐ লোকটি আমাদের সকল মানব সম্পদ ধ্বংস করেছে। পাপের কেন্দ্রগুলো তার আমলে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। ফলে তেহরানে বইয়ের দোকানের চেয়ে মদের দোকানের সংখ্যা বেশি হয়ে ছিল। পাপের সকল আকর্ষণীয় কেন্দ্রগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। সিনেমা হলগুলোকে পাপ কেন্দ্রে পরিণতকরার প্রয়োজনীয়তাটা কী? আমরা সিনেমা, রেডিও বা টেলিভিশনের বিরোধী নই; আমরা বিরোধিতাকারী পাপের এবং এসব মাধ্যমগুলোকে যুবসসমাজের পশ্চাৎপদতার ও তাদের শক্তিকে নিস্ড়েজ করার কাজে ব্যবহারের বিষয়ে। আমরা এসব প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের কখনো বিরোধী ছিল না, কিন্তু এগুলো যখন ইউরোপ থেকে প্রাচ্যে বিশেষত ইরানে আমদানিকরা হয় তখন তা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সভ্যতার অগ্রগতির পরিবর্তে বর্বরতার কাজে ব্যবহৃত হয়। সিনেমা হচ্ছে একটি আধুনিক আবিষ্কার, যাকে শিক্ষাদানের কাজে ব্যবহার করা উচিত, কিন্ড়ু তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের যুবকদের বিভ্রান্ড় করার কাজে। আমরা সিনেমার এরূপ অপব্যবহারের বিরোধী এবং এরূপ অপব্যবহার হচ্ছে আমাদের শাসকদের স্বোচ্ছাচারী নীতির কারণে। (নিউজ লেটার, ২০০২ : ৪৩)।

ইতোমধ্যে ইরানের চলচ্চিত্র বিশ্ব চলচ্চিত্র অঙ্গনে অত্যন্ড় সম্মানজনক ও মূল্যবান স্থান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ইরানি চলচ্চিত্রের মৌলনীতির ভিন্নতা একে যেমন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছ তেমনি একে করেছে জনপ্রিয় ও আদৃত। ইরানি চলচ্চিত্রে তথাকথিত জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের মতো সন্ত্রাস ও নগ্নতা নেই;

কিন্তু দর্শক চাহিদা আছে ব্যাপক। ইরানি চলচ্চিত্রে সুন্দর গল্প আছে, আছে জীবনবোধ, আর আছে ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। সবকিছু এতটাই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, অবাস্ড়ব মনে হয় না, বরং জীবনঘেঁষা অনেক চলচ্চিত্র বিশ্বজনীনতা অর্জন পর্যন্ড় করতে পারছে। তাথাকথিত জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের উপাদান না থাকার পরও ইরানি চলচ্চিত্র দেশ বিদেশে, বক্স অফিসে হিট ও সুপার হিট হয়েছে। চুটিয়ে ব্যবসা করছে এবং চলচ্চিত্রের জগতে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। ইরানি চলচ্চিত্র কট্টর ইরানবিরোধীরা পর্যন্ড়এ ধারার চলচ্চিত্রের প্রশংসা করছে। পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমে ইরানি চলচ্চিত্র সম্পর্কে যে লেখা প্রকাশিত হয় তা থেকেই এ সকল তথ্য জানা যায়। ইরানি চলচ্চিত্রের দর্শকপ্রিয়তাই বাধ্য করেছে ইরান বিরোধীদের একাজ করতে। ইরানি চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের পযন্ড়র্ আকৃষ্ট করেছে- এর গল্প নির্মাণশৈলী ও অভিনয়ের মানের ব্যাপারে। ইসলামি বিপে- াবোত্তর ইরানে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইরানি চলচ্চিত্রের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। বিগত বছরগুলোতে ইরানি চলচ্চিত্র বিশ্বের নামকরা ৪ হাজারের বেশি চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থাপন করে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ড় ২৪৭ টি আন্ড় র্জাতিক পুরস্কার অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উলে- খযোগ্য কয়েকটি চলচ্চিত্র হল:টু *বি আর নট টু বি*-এর কাহিনীকার ও পরিচালক কিয়ানুস আয়েরি এবং এর ব্যপ্তি ছিল ১০০ মিনিট। ***বার্থ অফ এ বাটারফ্লাই*** পরিচালক মুজাতাবা কায়েস। ব্যপ্তি কালছিল ১১০ মিনিট। *দি লিটল ম্যান* কাহিনীকার ও পরিচালক ইব্রাহিম

ফুর"জে। এর ব্যাপ্তিকাল হল ৮৫ মিনিট এবং ***বার খোরদ*** (সংঘাত) অন্যতম। (নিউজ লেটার: ১৯৯৯ : ৪০ ও ৪১)

(iii) রাজনৈতিক পট পরিবর্তন:

ইরানের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তা ইসলামি বিপ- বেরই ফল। প্রাক্তন শাহিজান্ড়র আমলে স্বৈরাচারী শাসকরা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণকেবাধাগ্রস্ড় করত। নিজেদের বাছাই করা প্রশাসক জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হত। রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহ না দেখানোর জন্য জনগণকে অনুপ্রাণিতকরা হত। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে জনগণকে দূরে রাখা হত। কিন্তু জনগণের মুক্তি ও স্বাধীন চেতনা থেকে উৎসারিত ইসলামি বিপ–ব শাহি আমলের চেতনা ও সংস্কৃতিকে ভেঙ্গে ফেলে। নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে দিল। সকলের অংশগ্রহণ ভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি জন্ম নিল।

ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সংবিধান সমাজের মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, রাজনৈতিক ব্যাপারে সকলের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে এবং সমাজে এই সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করেছে।

বর্তমান ইসলামি ইরানের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশেরসর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ রাহবারও ভোটে (referendum) নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্রের ১০৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যগণ রাহবারকে

নির্বাচিত করবেন। এছাড়া রাহবারকে বরখাস্ড় করার বিধান ও ইসলামি ইরানের সংবিধানে রয়েছে। (নিউজ লেটার, ১৯৯৯ : ২২)

সংবিধানের ১১১ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে রাহবার যদি তাঁর বৈধ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন কিংবা সংবিধানের ৫ ও ১০৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোনো একটি শর্ত পূরণ না করেন, কিংবা এটা যদি জানা যায় যে, প্রথম থেকেই তিনি কয়েকটি শর্তেরযোগ্য নন তাহলে তাঁকে এই দায়িত্ব থেকে বরখাস্ড় করা হবে। এটা নির্ভর করছে ১০৮ নং ধারায় বর্ণিত বিশেষজ্ঞদের বিচার বিবেচনার উপর।

এছাড়াও রাষ্ট্রের তিনটি শাখার ক্ষমতার উপরও সমাজের রাজনৈতিক আশা-আকাঙখার প্রভাব রয়েছে। নির্বাহী শাখার প্রধান হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট। রাহবারের পরেই তিনি দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সংবিধানের ১১৪ ধারায় রয়েছে প্রেসিডেন্টজনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত এবং দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হতে তার কোনো বাধা নেই। জনগণ কর্তৃক প্রেসিডেন্টকে বরখাস্ড় করার বিধানও সংবিধানে বর্ণিত রয়েছে।

সংবিধানের ৮১ ধারায় বলা হয়েছে, যদি নির্বাহী প্রধান হিসেবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মজলিসের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কৈফিয়ত তলব করেন, তাহলে নোটিশ পাওয়ার এক মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট মজলিসে হাজির হবেন এবং তাঁর কর্মকাে ের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। এরপর দুই-তৃতীয়াংশ মজলিস সদস্য যদি প্রেসিডেন্টের অযোগ্যতার

ব্যাপারে ভোট প্রদান করেন, তাহলে সংবিধানের ১১০ ধারার ১০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যাপারটি রাহবারকে জানানো হবে। এ ধারার উপর ভিত্তি করে রাহবার প্রেসিডেন্টের বরখাস্ড়র আদেশ প্রদান করতে পারেন।

এতে মজলিস সদস্যদের নির্বাচনে ও জনগণের রাজনৈতিক বিষয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। প্রতি ৪ বছরের জন্য এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানের ৭৬ ধারায় বলা হয়েছে, "ইসলামি পরামর্শ পরিষদ (মজলিস) রাষ্ট্রের সকল কর্মকাে খবরাখবর রাখার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত"। অধিকন্তু ৮৮ এবং ৮৯ ধারায় মজলিস সদস্যদের অধিকার দেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রি পরিষদের সদস্যদের প্রশ্ন করার এবং শেষ পর্যন্ড় তাদের প্রতি আনাস্থা ও বরখাস্ড় করার অধিকার ও সদস্যদের দেয়া হয়েছে এবং এই সদস্যরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত। (নিউজ লেটার, ১৯৯৯ : ২৩)

সমাজে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারণের বিধান রয়েছে সংবিধানে। যেমন গ্রাম পরিষদ, জেলা পরিষদ, শহর পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন হল-এর উদাহরণ। এ সকল পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য হল স্থানীয় জর"রি প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রেখে জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমেদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্যাগত এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে গতি সঞ্চার করা। এই সকল পরিষদের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, জনগণ এ সকল পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য মজলিসে পেশ করতে হয়। সংবিধানের ১০২

ধারায় বলা হয়েছে, প্রাদেশিক উচ্চ পরিষদ-এর ক্ষমতা ও দায়িত্বের আওতাধীন কিছু উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করে বাস্ড়বায়নের সুপারিশ করে সরাসরি বা সরকারের মাধ্যমে মজলিসে পেশ করার অধিকার রাখে।

এ থেকে বুঝা যায় যে, ইরানের সংবিধানে সে দেশের জনগণের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের জন্য জনগণকে ব্যাপক অধিকার দেয়া হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই ইরানের জনগণ নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়তে পারে। (তারেক, ২০০৮: ২২, ২৩)

(iv) অর্থনৈতিক পরিবর্তন:

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইরানের পরিসংখ্যান কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৩-১৯৯৪ অর্থবছরে (ইরানি সৌববর্ষ ১৩৭২ সালে) জাতীয় গড় উৎপাদন (GDP) ছিল ৯৩, ৮০০ বিলিয়ন রিয়াল। এই পরিসংখ্যান ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছরের গড় জাতীয় উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি। সে বছরে (বিপ- বের আগে) ইরানের জাতীয় গড় উৎপাদন ছিল মাত্র ৫২৭৫ বিলিয়ন রিয়াল। এ থেকে বুঝা যায় ইরানের জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে বিপ—বপূর্ব জিডিপির ১৮ গুণ। এই সময়ে দেশেটির জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ।

বিপ—ব পরবর্তীকালে ইরানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরওপরিষ্কার চিত্র তুলে ধরার জন্য আমরা ইরানের অভ্যন্ড়রীণ জাতীয় রাজস্ব খতিয়ান

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা করতে পারি। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে দেশটির আভ্যন্ড়রীণ জাতীয় রাজস্বের পরিমাণছিল৯১৩১৫.৩ বিলিয়ন রিয়াল। ১৩৫৭ ইরানি সালে এ পরিমাণ ৫০৮৬.২ বিলিয়ান রিয়ালের বেশি উঠতে পারেনি। এক্ষেত্রেও দুটি সময়ের ব্যবধানে আনুপাতিক বৃদ্ধি ১৮ গুণের কাছাকাছি।

ইরানে ইসলামি বিপ-ব বিজয়ের পর থেকে কৃষি খাতের উপর খুব গুর"ত্বারোপ করা হয়। অন্যান্য খাতের চেয়ে এই কৃষি খাতে স্বনির্ভরতা নিয়ে বেশি প্রচারণা হয়। এক্ষেত্রেপ্রাপ্ত তথ্য বেশ সন্ড়োষজনক।

১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে কৃষিখাতে সংযোজিত প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৯৪৪৬.১ বিলিয়ন রিয়াল। অপর দিকে ১৩৫৭ ইরানি সালে এই পরিমাণ ৬৬৯ বিলিয়ন রিয়ালের বেশি ছিলনা। অন্য কথায় বলতে গেলে বর্তমান বাজারদর হিসেবে ইরানের কৃষিখাতে সংযোজিত প্রবৃদ্ধি ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে এটি একটি বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি। কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই ইরান কৃষিপণ্য রফতানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। বিপ-বের পূর্বে ইরান কৃষিপণ্য আমদানি করত। এখন ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান একটি বৃহৎ কৃষিপণ্য রফতানিকারক দেশ।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী শিল্প ক্ষেত্রেও ইরান বেশ অগ্রগতি সাধন করছে। এক্ষেত্রে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ-বছরে ইরানের সংযোজিত প্রবৃদ্ধির পরিমাণছিল১২৮৭২.৩ বিলিয়ন রিয়াল। খ্রিষ্টীয় ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছরে (১৩৫৭

ইরান সৌরবর্ষ) যার পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৪৮.১ বিলিয়ন রিয়াল। এই পরিসংখ্যান থেকে প্রমাণিত হয় ১৩৫৭ থেকে ১৩৭২ সাল পর্যন্ড় শিল্প ক্ষেত্রে ইরানের সংযোজিত প্রবৃদ্ধির হার বর্তমান বাজারদর অনুসারে ৩০গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই চিত্র প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পথে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের আসাধারণ সফলতার স্বাক্ষর বহন করছে। ইরানের শিল্প নির্মাণ ক্ষমতার প্রশ্নটি খুবই গুর"ত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে যুদ্ধ পরবর্তী বছর গুলোতে। শিল্প বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিশেষ করে পেট্রো রসায়ন ও ইস্পাত ক্ষেত্রে ইরানের ক্ষমতা ও দক্ষতা কাজে লাগালে আগামী বছরগুলোতে ইরানের শিল্প উন্নয়নে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হবে।

খনি শিল্পেও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৩৫৭ ইরানি সালে এ ক্ষেত্রে ইরানের সংযোজিত মূল্য ছিল৩২.৪ বিলিয়ান রিয়াল। ১৩৭২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯৫ বিলিয়ান রিয়াল।

শিল্পখাতে একটি গুর"ত্বপূর্ণ অংশ হলতেল শিল্প। বিপ□ব পূববর্তীকালে এই শিল্পের প্রযুক্তিগত জটিলতা এবং এই শিল্পে দক্ষতা অর্জন থেকে ইরানি বিশেষজ্ঞদের দূরে রাখার ফলে বিশ্বের কোনো কোনো মহলের ভুল ধারণা ছিলযে, ইসলামি বিপ- বের পরে ইরানের তেলশিল্প অর্থনৈতিক দৈন্যে ভুগবে। বিপ- ব পূর্বকালে ইরানের অনেক তেলকূপে অগ্নিকা"ের পরও ইরানের তেল

শিল্পের উন্নয়ন বন্ধ হয়নি। তেল শ্রমিক ও এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিরলস প্রচেষ্টারফলে তেল শিল্পে ইসলামি ইরানের সংযোজিত প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছরে (১৩৫৭) ১১৭১.৯ বিলিয়ন রিয়াল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ১৬৪৯৫ বিলিয়ন রিয়ালে দাঁড়িয়েছে। এ চিত্র নিঃসন্দেহে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক। কৃষি উৎপাদনের পরিসংখ্যান নিচের চিত্রের মাধ্যমে আরো পরিস্কার হয়ে উঠবে।

কৃষি উৎপাদন

ক্রমিক নং	পণ্যের ধরন	১৩৫৬ ইরানি সাল	১৩৭১ ইরানি সাল
০১.	সবজি	১৩০০	১০৫০০
০২.	ফল	২৬০০	৭৯০০
০৩.	আলু	৭৫০	২৬০০
০৪.	পেঁয়াজ	৫০০	১১০০
০৫.	গম	৫১০০	১০২০০
০৬.	যব	৯০০	৩০০০
০৭.	দান	১১০০	২৩০০
০৮.	শস্য	২১০	৬২০
০৯.	চিনি	৬৯০	৯০০
১০.	তুলা	১৭৫	১০০

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনের খাত	১৯৭৮-৭৯ বিলিয়ন রিয়াল	১৯৯৩-৯৪ বিলিয়ন রিয়াল	বৃদ্ধির হার
১। জিডিপি	৫, ২৭২.০০	৯৩৮০০.০০	১৮ গুণ
২। জাতীয় আভ্যন্ড়রীণ রাজস্ব	৫, ০৮৬.২০	৯১৩১৫.০৩	১৮ গুণ
৩। কৃষি খাতে সংযোজিত প্রবৃদ্ধি	৬৬৯.০০	১৯৪৪৬.১০	৩০ গুণ
৪। শিল্প খাতে সংযোজিত প্রবৃদ্ধি	৪৪৮.১০	১২৮৭২.৩০	৩০ গুণ
৫। খনিখাতে সংযোজিত প্রবৃদ্ধি	৩২.৪০	৫৯৫.০০	১৫ গুণ
৬। তেলখাতে সংযোজিত প্রবৃদ্ধি	১১৭১.৯০	১৬৪৯৫.০০	১৫ গুণ

(নিউজ লেটার, ২০০১ : ১৫-১৭)

(v) সামরিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনঃ

পাহলভি শাসকগোষ্ঠী সবসময়ই ইরানের সেনাবাহিনীকে পরাশক্তির বিশেষত আমেরিকার উপর নির্ভরশীল করে তোলার চেষ্টা করেছে। এ কাজে তারা অনেকাংশে সফল হয়। বিদেশি সামরিক উপদেষ্টারা বিশেষত আমেরিকান সামরিক অফিসারদেরকেই ইরানি সেনাবাহিনীর প্রকৃত শাসক বলে মনে করা হত। প্রকৃতপক্ষে একজন আমেরিকান ননকমিশন অফিসার পদস্থ ইরানি সেনা

অফিসারদের থেকেও উপরের অবস্থানে ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল বহু বৈষম্য। এটা মানবিক, ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতিমালার বিরোধী। ইরানে ছিল আমেরিকান সেনাবাহিনীর অসংখ্য ঘাটি। প্রকৃত পক্ষে ইরানি সেনাবাহিনী এ অঞ্চলে আমেরিকার স্বার্থে সেবায় নিয়োজিত ছিলএবং এ জন্য আমেরিকাকে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হত না। মুসলমানদের দমন ও ফিলিস্ড়িন দখলকারি সরকারকে সাহায্যের জন্য ইরানি সেনাবাহিনী ও ইরানের ভূ-খ ব্যবহার করা হত। (নিউজ লেটার, ১৯৯৯ : ২৮)।

ইরানে ইসলামি বিপ- বের বিজয়ের পরে ইরান থেকে সকল আমেরিকান সামরিক উপদেষ্টা বহিষ্কার করা হয়, সকল আমেরিকার ঘাঁটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে, সেনাবাহিনীতে খাদ্য, চিকিৎসা সুবিধা, অবসরভাতা ও ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত সকল বৈষম্য দূর করা হয়। একজন অধিনায়ক থেকে সাধারণ জওয়ান পর্যন্ড় সকলে একইসুযোগ সুবিধা ভোগ করে।

বিপ ব বিজয়ের পরে, পূর্ব ও পশ্চিমা জগতের সাথে সম্পর্কিত উপদলগুলো ইরানি সেনাবাহিনী বিলোপ করে সে জায়গায় একটি পুরোপুরি নতুন সামরিক বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করে। তারা যুক্তি দেখায় যে, পাহলভি শাসনের শেষ দিকে তথ্য বিশেষকরে বিপ- বের বিজয়ের চূড়ান্ড় মুহূর্তে সেনা অধিনায়কদের আচরণের কারণে গোটা বাহিনীকে বাদ দিতে হবে। তারা বলে জনতার বিরূদ্ধে দ ায়মান সেনাবাহিনী বিলোপ করা উচিত।

বিপ-বের নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট ছিলযে, সেনাবাহিনী বিলোপ করার শে-াগান ইসলামি বিপ-বের প্রতি হুমকি এবংএর ফলে কেবল পরাশক্তিদের চররাই লাভবান হবে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে ইরানি বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিশেষত ননকমিশন অফিসার এবং ভর্তি হওয়া জওয়ানরা হয় ইসলামি বিপ-বের পক্ষে ছিলঅথবা-এর বিরোধিতা করতনা। এদের অধিকাংশই পাহালভিশাসনের প্রতি এবং সে সময়ে সেনাবাহিনীতে বিরাজিত দমনমূলক ব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে পাহালভি সরকার জাতির বিরূদ্ধে যেসব অপরাধ করেছে সেগুলো পাহলভি সরকার ও তার প্রভু আমেরিকান সরকারের সহযোগিতার ফসল। এর দায়িত্ব গোটা সেনাবাহিনী বিশেষ করে নন কমিশন্ড ও নিম্নপদের অফিসারদের উপর চাপানো উচিত নয়। এরা হয় ইসলামি বিপ-বের বলিষ্ঠ সমর্থক ছিল অথবা দেশের মধ্যকার চিন্ড়াধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে ইসলামি বিপ-বের প্রতি ছিলউদাসীন। বিপ-বের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরে এরা বিপ-বী জনতার কাতারে শামিল হয়। ১৯৭৮-এর আশুরায় লাভিজান ঘটনা এবং ইমাম খোমেনীর নির্দেশমত বিপ-বের বিজয়ের পূর্ববর্তী কয়েকমাসে সেনাবাহিনীর ত্যাগের ঘটনার মধ্যেই এটা মূর্ত হয়েছে। সেনা অধিনায়কদের পুরোপুরি হতাশাই হচ্ছে ঐ সরকারের (পাহলভি) প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্যহীনতার এবং জনগণের ইসলামি বিপ-বের প্রতি সমর্থনের সহজাত প্রবনতার সর্বোত্তম প্রমাণ। এ বিষয়টির সাথে সাথে ইমাম খোমেনী আরো উপলব্ধি করেন যে, নিরস্ত্র ইরান বৃহৎ শক্তিবগের্র আক্রমণের পথ খুলে দেবে। এ উপলব্ধির পরেই তিনি

সেনাবাহিনীর প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানান। এভাবেই তিনি সেনাবাহিনী বিলোপ করার আহবান ভন্ডুল করে দেন। ইমামের পরিচালনাধীনে সেনাবাহিনী ক্রমান্বয়ে নৈতিক শক্তি ফিরে পায় এবং ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়। সর্বাপেক্ষা গুর"ত্বপূর্ণ সময়গুলোতে, যেমন ইরানের উপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের সময়ে বিপ-বের সাহায্যে দ্র"ত এগিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ইমাম খোমেনীর গৃহীত অবস্থানের কারণে সেনাবাহিনীকে অদক্ষ বাহিনী থেকে প্রকৃত বাহিনীতে রূপান্ড়র করা সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সরঞ্জাম নির্মাণ ও রক্ষণা-বেক্ষণের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী স্বণির্ভরতা অর্জনের দিকে এগুচ্ছে।

ইসলামি বিপ-ব বিজয়ের দেড় বছর পরে প্রতিদিন একশত সাব-মেশিনগান তৈরি করা হত। এখন এ সংখ্যা দৈনিক ৩'শটি ইউনিটে পৌঁছেছে এবং দৈনিক পাঁচশটি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা রয়েছে। প্রতিরক্ষা শিল্পের ব্যাটারি প্রস্তুত কারখানায় ১৯৭৯ সালে দৈনিক প্রায় এক হাজার ব্যাটারি তৈরি হত। এখন এ পরিমাণ ৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

এ পরিসংখ্যান বিপ-বের বিজয়ের দেড় বছর পরে, ১৯৮০'এর প্রথমার্ধে ও ইরানের উপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের আগে বিপ-বের বিজয়ের আড়াই বছর এবং যুদ্ধ শুর" হওয়ার প্রায় এক বছর পরে অস্ত্র উৎপাদন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের হার ও পরিমাণ উলে-খযোগ্যভাবে বেড়েছে। (নিউজ লেটার, ২০০১ : ১৫-২১)।

Dhaka University Institutional Repository

(vi) ইসলামি বিপ- বের পূর্বাপর ইরান সরকারের কর্মতৎপরতা:

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান আক্ষরিক অর্থেই একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ইসলামি সরকার আল–াহ তায়ালা ও জনগণের নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে রাষ্ট্রীয় তথা জনগণের তহবিলকে জনগণেরই কল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যবহার করছে। বিপ- বের পূর্বে শাহি সরকার অযোগ্যতা, ভোগবিলাস, অপচয়, দুর্নীতি, আত্নসাৎ ও পরাশক্তির পদলেহনের কারণে ইরানের প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় সাধন ছাড়া কার্যত জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তেমন কিছুই করেনি। কিন্তু ইসলামি বিপ- বের পরে বিপ–বকালীন অর্থনৈতিক দুরাবস্থার ওপরে মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধ, ইরাকের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া আট বছরব্যাপী ধ্বংসাত্নক যুদ্ধ এবং প্রায় ৪০ লক্ষ আফগান ও ইরাকি শরণার্থীর চাপ মোকাবেলা করেও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সরকার দেশকে সকল দিক দিয়ে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যাবার লক্ষমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আজকের ইরান নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এবং বিশ্বের বুকে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এ সাফল্য ইসলামি বিপ–বপূর্ব ও বিপ- বোত্তর সরকারের কর্মতৎপরতা তুলনা করার মধ্যদিয়ে তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে প্রতি বছর ২ থেকে ৮ শাহরিভার (২৪ থেকে ৩০ আগস্ট) রাষ্ট্রসপ্তাহ পালিত হয়। এ সময় জনগণের নিকট সরকারের কর্মতৎপরতা তুলে ধরা হয়। তেহরান থেকে প্রকাশিত মাসিক 'ইয়াদে

আইয়াম'-এর শাহারিভার ১৩৭৪ (২৩ আগস্ট ১৯৯৫-২২ সেপ্টম্বর ১৯৯৫) সংখ্যায় এ উপলক্ষে ইসলামি বিপ- বের পূর্ব ও পরে ইরান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মতৎপরতা ও সাফল্যের এক সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক খতিয়ান পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। নিম্নে এর একটি নমুনা উপস্থাপন করা হল :

উলে- খ্য ১৩৫৭ ইরানি/ সৌর সালের ২২ বাহমান (২১ ফেব্র"য়ারি ১৯৭৯) ইরানে ইসলামি বিপ—ব সাফল্যমন্ডিত হওয়ার পর ইসলামি সরকারের পদযাত্রা শুর" হয়। ২১ মার্চ থেকে সৌরসাল বা ইরানি সাল শুর" হয় এবং তা পরবর্তী বছরের ২০ মার্চে সমাপ্ত হয়। সে হিসাবে ১৩৫৮ ইরানি/ সৌর সাল (২১ মার্চ ১৯৭৯-২০ মার্চ ১৯৮০) হচ্ছে ইসলামি সরকারের প্রথম বছর। এখানে সংক্ষেপ বিপ—বকালীন ও এর পরবর্তী কয়েক বছরের কর্মতৎপরতার একটি চিত্র তুলে ধরা হল। অবশ্য কিছু কিছু পরিসংখ্যান পাওয়াও যায়নি। এখানে সামগ্রিক একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান রেলওয়ে

বিষয়ভিত্তিক বিবরণ	একক	১৩৫৮ ১৯৭৯-৮০	১৩৬৭ ১৯৮৪-৮৯	১৩৭২ ১৯৯৩-৯৪	১৩৭৩ ১৯৯৪-৯৫	১৩৭৩
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা	ব্যক্তি	৩৪, ৫৮৭	৩৭, ১৭৮	৩৪, ৪৪৮	৩৪, ১৬৭	
মালামাল পরিবহন	হাজার হিসাবে	৬, ১৩৮	১২, ৯৫৭	১৯, ৮৪৮	২১, ৪০০	
বহনকৃত যাত্রী সংখ্যা	হাজার হিসাবে ব্যক্তি	৬, ১০২	৬, ৭৯৯	৯, ১৬৭	৯, ৪০০	
গড়ে প্রতি কিলোমিটার রেল লাইনে বহনকৃত মালের পরিমাণ	ট্রেন	১, ৩৪৪	২, ৮৩৬	৩, ৯২১	৪, ০৭৬	
গড়ে প্রতি কিলোমিটার রেল লাইনে বহনকৃত যাত্রীর সংখ্যা	ব্যক্তি	১, ৩৩৬	১, ৪৮৮	১, ৮০২	১, ৭৯০	
গড়ে কর্মচারী প্রতি বহনকৃত মালের পরিমাণ	কর্মচারী পিছুটান	১৭৭	৩৪৮	৫৭৫	৬২৬	
ব্যয় নির্বাহে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ	ব্যয়ের অংশ (শতকরা)	৬১.৬	২৭.৬	-	-	

গড়ে ওয়াগণ প্রতি বার্ষিক মাল বহনের পরিমাণ	টন	৫০০	৯৯১	১, ৪৮৭	১, ৪৪৯
বার্ষিক মাল বহনের পরিমাণ	টন	৪৮	৮৮	১৮০	১৪৩

সম্প্রসারিত বহন ক্ষমতা (ক্যাপাসিটি) প্রতি কিলোমিটার

বিষয়ভিত্তিক বিবরণ (১৯৭৮-৭৯)	**১৩৫৭ (১৯৯৪-৯৫)**	**১৩৭৩**
মাল বহন (টন)	৬৯, ৪২, ০০০	২, ৩০, ০০, ০০০
যাত্রী পরিবহন (ব্যক্তি)	৫৪, ১৯, ০০০	১, ০, ০০, ০০০
রেল লাইন স্থাপন (মিটার)	-	২, ৭১, ৭৭৯

ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়ের কর্মতৎপরতা

বিষয়ভিত্তিক বিবরণ (১৯৭৮-৭৯)	১৩৫৭ (১৯৮৯-৯০)	১৩৬৮ (১৯৯৪-৯৫)	১৩৭৩	একক
স্থাপনকৃত টেলিফোন সংখ্যা	৮, ৫০, ০০০	২১, ০০, ০০০	৫৪, ০০, ০০০	সংখ্যক
পল-ী টেলিগ্রাফ/ টেলিফোন অফিস	৩১২	৩, ২২০	৮, ৬৮৯	গ্রাম
ট্রান্সফার ও নেটওয়ার্কের ধারণ ক্ষমতা	১৭, ১৫৮	৪৩, ৪২৭	১, ৩৬, ৮৬০	চ্যানেল
কোডবিশিষ্ট শহর ও পল□া এলাকা	৭৩	৩৩৫	১, ১৬০	এলাকা
প্রতি হাজার সংখ্যক টেলিফোনের জন্য টেলিগ্রাফ টেলিফোন বিভাগের কর্মী	৩৮	২৮	১৪	ব্যাক্তি

সংখ্যা				
পোস্টাল ইভেন্ট	২, ৩১৫	৩, ৮৬২	৭, ০৩৯	ইউনিট
প্রতি পোস্টাল ইউনিটের আওতাধীন এলাকা	৭১২	৪৭২	২৩৪	বর্গ কিলোমিটার
প্রতি পোস্টাল ইউনিটের আওতাধীন জনসংখ্যা	১৪, ৬৮৭	১৩, ৬০২	৮, ৬৬৬	ব্যক্তি
নতুন পোস্টাল সার্ভিস	-	৩	৯১	সার্ভিস

বিষয় ভিত্তিক বিবরণ	**১৩৫৭ (১৯৭৮-৭৯)**	**১৩৭২ (১৯৯৩-৯৪)**	**একক**
জাতীয় ও বৈদেশিক যোগাযোগের সাধারণ ও সর্বজনীন টেলিফোন সংখ্যা	৪, ২৯৪	১৯, ৪৫৮	সংখ্যা
টেলেক্স	৩, ২৫২	৯, ৭৯৬	সংখ্যা
আন্তঃনগর স্বয়ংক্রিয় চ্যানেল সংখ্যা	৫, ৯৯৫	৫০, ৯০০	চ্যানেল
মাইক্রোওয়েভ চ্যানেল সংখ্যা	১৪, ২১৪	১, ০৫, ৩৪২	চ্যানেল
আন্তর্জাতিক চ্যানেল সংখ্যা	৪২৯	২, ৪২০	চ্যানেল
আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ বিশিষ্ট শহর সংখ্যা	১৮	১০৪	অঞ্চল

❑ ইসলামি বিপ- বের পূর্বে ইরানে সংবাদপত্র ও সাময়িকী :

ইসলামি বিপ-ব বিজয়ের পূর্বে ইরানে যেসব পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশিত হত এবং বাজারে পাওয়া যেত তার একটা পরিসংখ্যান নিম্নে ১ ও ২ নং ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হল। এতে ইরানের শহর ও মফস্বল উভয় জায়গা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা-সাময়িকী শামিল রয়েছে। তেমনি প্রকাশ বিরতি অর্থাৎ একই পত্রিকার পরপর দুটি সংখ্যা প্রকাশের মধ্যবর্তী মেয়াদের ভিত্তিতে তা স্বতন্ত্রভাবেও দেখানো হয়েছে।

ছক নম্বরঃ ১

১৩৩৩ (১৯৫৪-৫৫) থেকে ১৩৪৩ (১৯৬৪-৬৫) পর্যন্ড় এক দশককালে ইরানে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রাপ্ত হিসাব :

ক্রমিক	**ক্যাট্যাগরি**	**প্রাপ্ত হিসাব যে সংখ্যক পত্রিকা-সাময়িকী কভারে পাওয়া যায়**
১.	দৈনিক পত্রিকা	২৫
২.	সাপ্তাহিক সংবাদপত্র	২৫
৩.	সাপ্তাহিক সাময়িকী (ম্যাগাজিন)	২৬
৪.	মাসিকপত্র	৪২
৫.	ঋতুপত্র (ত্রৈমাসিক)	১
৬.	বার্ষিকী	৭
	মোট	২২৬

উলে- খ্য, ইরানে বছরে ঋতু সংখ্যা চারটি।

Dhaka University Institutional Repository

ছক নম্বর-২

১৩৪৩ ইরানি/ সৌর সাল (১৯৬৪-৯৫ খ্রি.) থেকে ১৩৫৩ ইরানি/ সৌর সাল (১৯৭৪-৭৫ খ্রি.) পর্যন্ড় এক দশক কালে ইরানের সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রাপ্ত হিসাব:

ক্রমিক	**পত্রিকা ও সাময়িকীর ক্যাটাগরি**	**তেহরান শহর থেকে প্রকাশিত**	**মফস্বল থেকে প্রকাশিত**	**মোট**
১.	দৈনিক পত্রিকা	২১	৭	২৮
২.	সাপ্তাহিক সংবাদপত্র	২৭	৬১	৮৮
৩.	সাপ্তাহিক সাময়িকী (ম্যাগাজিন)	২৬	৩	২৯
৪.	মাসিকপত্র	৫৫	২	৫৭
৫.	ঋতুপত্র তৈমাসিক	১	১	২
৬.	বার্ষিকী	৫	-	-
	মোট	১৩৫	৭৪	২০৯

❑ ইসলামি বিপ- বের বিজয়ের পর ইরানের সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রাপ্ত হিসাব (Availability):

ইসলামি বিপ- বের পরে ইরানে ব্যাপকভাবে নতুন নতুন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এখানে ৩ নম্বর ছকে বিপ- ব সাফল্যমি"ত হওয়ার পর অর্থাৎ ১৩৫৮ ইরানি/ সৌর সাল (১৯৭৯-৮০ খ্রি.) থেকে ১৩৭৩ ইরানি/ সৌর সাল (১৯৯৪-৯৫ খ্রি.) পর্যন্ড় ইরানে যেসব সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশের জন্য অনুমতিপত্র ইস্যু করা হয় এবং তা প্রকাশিত হয় তার সালওয়ারি পরিসংখ্যান প্রদর্শন করা হয়েছে। অন্যদিকে ৪নং ছকে ১৩৭৩ ইরান/ সৌর সালে (৯৯৪-৯৫ খ্রি.) বাজারে যেসব পত্রিকা ও সাময়িকী পাওযা যায় তার ক্যাটাগরিভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছক নম্বর-৩

সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশের অনুমতিপত্র ইস্যুর সালওয়ারি পরিসংখ্যান

ক্রমকি নং	প্রকাশের অনুমতি প্রদানের বছর	প্রাপ্ত হিসাব (বাজারে প্রাপ্তি সংখ্যা
০১.	১৩৫৮ (১৯৭৯-১৯৮০)	২১
০২.	১৩৫৯ (১৯৮০-১৯৮১)	৮
০৩.	১৩৬০ (১৯৮১-১৯৮২)	৫
০৪.	১৩৬১ (১৯৮২-১৯৮৩)	-
০৫.	১৩৬২ (১৯৮৩-১৯৮৪)	২
০৬.	১৩৬৩ (১৯৮৪-১৯৮৫)	১৯
০৭.	১৩৬৪ (১৯৮৫-১৯৮৬)	১৮
০৮.	১৩৬৫ (১৯৮৬-১৯৮৭)	৭
০৯.	১৩৬৬ (১৯৮৭-১৯৮৮)	২১
১০.	১৩৬৭ (১৯৮৮-১৯৮৯)	১১
১১.	১৩৬৮ (১৯৮৯-১৯৯০)	৮৫
১২.	১৩৬৯ (১৯৯০-১৯৯১)	১৩৯
১৩.	১৩৭০ (১৯৯১-১৯৯২)	১১৯
১৪.	১৩৭১ (১৯৯২-১৯৯৩)	৯৪
১৫.	১৩৭২ (১৯৯৩-১৯৯৪)	৯৯
১৬.	১৩৭৩ (১৯৯৪-১৯৯৫)	*

* অত্র প্রতিবেদন রচনা ইরানি/ সৌর ১৩৭৩ সালে অসমাপ্ত ছিল।

এখানে উক্ত বছরে যেসব সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয় এবং তা বাজারে আসে তার পরিসংখ্যান দেয়া সম্ভব হয়নি।

ছক নম্বর-৪

১৩৭৩ ইরানি /সৌর সালে (১৯৯৪-১৯৯৫) খ্রি.) ইরানে যেসব সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হয় এবং বাজারে পাওয়া যায় তার ক্যাটাগরি ভিত্তিক তালিকা:

ক্রমকি নং	ক্যাটাগরি	প্রাপ্ত হিসাব
০১.	দৈনিক পত্রিকা	২৭
০২.	সপ্তাহে তিন সংখ্যাবিশিষ্ট পত্রিকা	১
০৩.	সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন	১০৬
০৪.	দশ দিনে এক সংখ্যা বিশিষ্ট সাময়িকী	১
০৫.	পাক্ষিক ম্যাগাজিন	২৯
০৬.	মাসিকপত্র	১৭৯
০৭.	দ্বিমাসিকপত্র	২৫
০৮.	ঋতুপত্র (ত্রৈমাসিক)	১৩২
০৯.	বছরে তিন সংখ্যাবিশিষ্ট সাময়িকী	২
১০.	ষান্মাষিকপত্র	১৪
১১.	বার্ষিকী	৩
১২.	প্রকাশিত হচ্ছে এমন সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মোট সংখ্যা	৫১৯

এখানে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ক্যাটাগরি প্রসঙ্গে উলে-খ করা প্রয়োজন যে, দৈনিক পত্রিকা ছাড়া অন্যান্য পত্রিকা ও সাময়িকী ঠিক যে মেয়াদ পর পর প্রকাশের কথা উলে-খ করে প্রকাশনার অনুমতিপত্র নেয়া হয়েছে কোনো ক্রমেই বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব সমস্যার কারণে সে মেয়াদ সীমা রক্ষা করতে পারেনি। এখানে ৪ নম্বর ছকে সংস্কৃতি ও ইসলামি দিক নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের সংবাদপত্র ও সাময়িকী উদ্ধার কমিটির সিদ্ধান্ড়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে হিসাব করা উপরিউক্ত পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও বিন্যস্ড় করা হয়েছে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রেডিও-টেলিভিশন

তথ্য শিরোনাম			সংখ্যা (পরিমাণ) শতকরা	
			১৩৫৭ ইরানি সাল (১৯৭৮-৭৯)	**১৩৭৩ ইরানি সাল (১৯৯৪-৯৫)**
আওতাভুক্ত জনসংখ্যা	টেলিভিশন	১নং চ্যানেল	শতকরা ৭৪.২	শতকরা ৯১.৪
		২নং চ্যানেল	শতকরা ৪৬.৩	শতকরা ৮৪.৬
		৩নং চ্যানেল	-	শতকরা ৩৫.৯
	রেডিও	জাতীয় চ্যানেল	শতকরা ৮১.১	শতকরা ৮৩.৩
		প্রাদেশিক চ্যানেল	শতকরা ৩২.২	শতকরা ৬৯.৯
		(এফ.এম রেডিও)	শতকরা ৩০.৪	শতকরা ৭৫.৪
বিভিন্ন ধরনের চ্যানেল	টেলিভিশন	অভ্যন্ড়রীণ কার্যক্রম	২	৩
		বহিবিশ্ব কার্যক্রম	-	২ ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার
	রেডিও	অভ্যন্ড়রীণ কার্যক্রম	-	৩
		বহিবিশ্ব কার্যক্রম	২ ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার	১৬ ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার
টেলিভিশেনের ট্রান্সমিটার সংখ্যা			৩৫৭	১, ৫১৯

তথ্য শিরোনাম			সংখ্যা (পরিমাণ) শতকরা	
			১৩৫৭ ইরানি সাল (১৯৭৮-৭৯)	১৩৭৩ সাল (১৯৯৪-৯৫)
রেডিও-টেলিভিশনের অনুষ্ঠান প্রযোজনার পরিমাণ	টেলিভিশন	১নং চ্যানেল	১, ৯১৯.০০	২, ২৫৬.৫৮
		২নং চ্যানেল	৬১০.০০	১, ৭০০.০০
		৩নং চ্যানেল	-	১, ৪৭৪.০৮
		মফস্বল কেন্দ্রসমূহ	২, ৩৭৫.০০	৪, ০৬১.০৮
		বহিবিশ্ব সার্ভিস	-	৭৬৩.০০
	রেডিও	১নং চ্যানেল	৮, ৬২০.০০	৭, ৪২১.০০
		২নং চ্যানেল (রেডিও কোরআন ও অন্যান্য যার অন্ড়র্ভুক্ত)	২, ৮০৮.০০	১, ৮৭০.৪৫
		রেডিও তেহরান	-	২, ৭৫১.৪৫
		বহিবিশ্ব কর্মকান্ড	-	৮, ৭২.৪৪
রেডিও-টিভির অনুষ্ঠান প্রচারের	টেলিভিশন	১নং চ্যানেল	৩, ৬৭২.০০	৪, ৯৯৯.০৩
		২নং চ্যানেল	১, ৯৪৬.০০	৩, ৫৪৮.০০
		৩নং চ্যানেল	-	২, ০৯০.০০
		মফস্বল কেন্দ্রসমূহ	৫, ৫৪৩.৩০	৯, ২৪৩.৫০

পরিমাণ		বহিবিশ্বকর্মকা	-	১, ৩৫০.০০
	রেডিও	১নং চ্যানেল	৮, ৬২০.০০	৮, ৭৬০.০০
		২নং চ্যানেল	২, ৮০৮.০০	২, ৯৬৮.৪৫
		রেডিও তেহরান	-	৬, ০৪২.০০
		রেডিও পয়াস	-	৫, ৭২২.৩০
		বহিবিশ্ব কার্যক্রম	-	২২, ২৬৪.৩৬

(নিউজ লেটার, ১৯৯৬: ৫৮-৬১)

(খ) বহির্বিশ্বে-এর প্রভাবঃ

ইরানের ইসলামি বিপ-ব যে জন্য অনন্য তা হচ্ছে, কোনো সুপার পাওয়ারের তথা পরাশক্তির উপর নির্ভর করে এ বিপ-ব সাধিত হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরূদ্ধে ভিয়েতনামের জনতার বিজয় পরাশক্তি আমেরিকার অজেয় ক্ষমতার গাল-গল্পকে অসত্য প্রমাণ করেছে। কিন্তু একটি জাতি যাকে পরাশক্তির সাহায্য করেছে সে অবশ্যই অপর পরাশক্তির বিরূদ্ধে জয়ী হবে। কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। দীর্ঘ দিনের অধিকারহারা একটা জাতি দীর্ঘ ৫২ বছরের শাহিতন্ত্রের আধিপত্য কায়েমকারীর ট্যাঙ্ক ও রাইফেলের সম্মুখে অস্ত্রহীনভাবেই দাঁড়িয়ে গেল।

ইসলামি বিপ-বের পশ্চাতে মূল লক্ষ্য ছিল ইরানে খোদায়ী বিধানের আলোকে সার্বভৌমত্ব পুনপ্রতিষ্ঠা করা। আধিপত্য কায়েমকারী শক্তির বিরূদ্ধে

দীর্ঘ পনের বছর ধরে ইসলামি নেতৃত্বের বিরামহীন বিরোধিতা জনতার মাঝে সচেতনতা এনেছে। ইসলামি বিপ- বের নেতা ইমাম খোমেনী ১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে বলেন: 'দুনিয়ার জানা উচিত যে, মি: কেনেডি (তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট) ইরানি জনতার কাছে সর্বাধিক ভয়ানক লোক। নির্বাসনে যাওয়ার পূর্বে ইমাম খোমেনী ভবিষৎবাণী করেছিলেন আজকের রাজনীতিতে যেসব ইরানি শিশু জন্ম গ্রহণ করবে চূড়ান্ড় পর্যায়ে তারাই শাহকে দেশত্যাগে বাধ্য করবে' (নিউজ লেটার, ১৯৮৮: ৩৪) । আট বছর পূর্বেকার এ ভবিষ্যৎবাণী বাস্ড়বরূপ নিয়েছে। বিশ্ব পরিমন্ডলে এ বিপ- বের যে প্রতিক্রিয়া ছিল নিম্নের আলোচনায় আমরা জানার প্রয়াস পাব।

(i) বিপ- ব বিরোধী দলের প্রতিক্রিয়া:

ইসলামি বিপ- ব নস্যাৎ করার অশুভ উদ্দেশ্য সামনে রেখে মার্কিন ও বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তত্ত্বধানে নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক দল গড়ে তোলা হয়েছিল। এইসব দলের কয়েকটি তাদের প্রভুদের পক্ষে নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর ক্ষেত্রে কিছুটা সফল হলেও বিপ- বের বিরূদ্ধে অর্থবহ সফলতা অর্জনে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

তাদের অনেকেই বিচারের ভয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গেছে এবং পাশ্চাত্যে আশ্রয় নিয়েছে। তারা এখনও মনে করে যে, পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে আসবে এবং তারা আবার তাদের অপকর্ম চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ

পাবে। তারা দেশ থেকে প্রচুর অর্থ চুরি করে নিয়ে গেছে এবং বিদেশে বিলাসবাহুল জীবন-যাপন করছে।

(ii) প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের প্রতিক্রিয়াঃ

১৯৭৯ সাল থেকেই এতদঞ্চলের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তাই তারা যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার চেষ্টা করছে। যেভাবে ইরানের শাহের পতন ঘটেছে ঠিক সে ধরনের পতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তারা এই পথ ধরে ছিল। এইসব শাসক যতদিন প্রকাশ্যে ইসলামি বিপ-বের বিরোধিতা থেকে বিরত ছিল ততদিন পাশ্চাত্যের উপর তাদের এতখানি নির্ভরতার কথা জানা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, এইসব প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার ফলেই পারস্য উপসসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের হস্ড়ক্ষেপ সম্ভব হয়েছে।

কাযর্ত তারাই ইসলামি বিপ-বের মানবিক দিকগুলোর বিরূদ্ধে পাশ্চাত্যের দেশগুলোকে সংঘটিত করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে প্ররোচনা দিয়েছে। তাদের এই কার্যকলাপই মার্কিন প্রশাসনকে আরব এলাকায় সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলতে, আন্ড়র্জাতিক পানিসীমাকে নিজেদের দখলে নিতে ও সেখানে মার্কিন নৌবহরের মহড়া চালাতে সাহসী করে তুলেছে। ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানেদের বৈপ-বিক চেতনাকে হুমকি প্রদানই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের এইসব তৎপরতার উদ্দেশ্য। এইসব ভীর" ও দুর্বল শাসকদের কাছে ইরানের

ভ্রাতৃসুলভ পরামর্শ অপেক্ষা ও যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরতা অনেক বেশি মূল্যবান বলে মনে হয়েছে।

এইসব শাসকের নৈতিক অধঃপতন তাদেরকে কতটা দায়িত্বহীন করে তুলেছে ১৯৮৭ সালে সৌদী রাজ পরিবার কর্তৃক হাজিদের নির্মম হত্যা কাণ্ডের মাধ্যমে তার প্রমাণ রেখেছে। সৌদী রাজ পরিবারের ইয়াহুদিপ্রীতি এবং তাদের মক্কা হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে তা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর তারা সে বিষয়টিকে গোপন রাখার প্রয়োজনবোধ করছেন। তা হচ্ছে তারা চায় সবকটা আরব দেশই ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিক এবং এই জন্যই আরবমৈত্রী বন্ধনের মধ্যে মিশর সরকারের সহজ প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। এই ধরনের শাসকদের একটা অশুভ চক্র এখন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের পক্ষে আশ্রয় নিয়েছে। এই পরিস্থিতিই একটি ইরান বিরোধী ফ্রন্টের দ্বার উন্মোচন করেছে এবং এটাই ইসরাইলকে অধিকৃত এলাকায় আন্ড়র্জাতিক সাংবাদিক সমাজের চোখের সামনেই ইয়াহুদিনিধন জোরদার করার সাহস যুগিয়েছে (নিউজ লেটার, ১৯৮৮: ২৮)।

(iii) পাশ্চাত্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রয়াঃ

বর্তমান শতকের সাড়া জাগানো উৎকৃষ্টতম চিন্ড়াধারা ইসলামি বিপ□ব এমনি মারাত্মকভাবে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ও প্রাচ্যের সাম্যবাদী সমাজের সোনালী স্বপ্নকে এমনি এক দিবাস্বপ্নে পরিণত করেছে যে, দৃশ্যত দুনিয়ার মধ্যে

পারস্পারিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিপ-বের তরঙ্গের গর্জনকে মুকাবিলা করার জন্য বাস্ড়ব ক্ষেত্রে এবং সত্যিকার ভাবেই তারা একটা বুঝা পড়ায় পৌঁচেছে।

কুদস জবরদখলকারী জায়নবাদী সরকারের নেতৃবৃন্দ সে সরকারের স্থায়িত্ব ও অস্ড়িত্বের বিরূদ্ধে এবিপ-বকে বৃহত্তম বিপদ বলে প্রায়শই অভিমত ব্যক্ত করছে। তারা বলছে: "ইরানি বিপ-ব হচ্ছে কমিউনিজম অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহ হুমকী এর্বং পাশ্চাতের কৌশলগত স্বার্থের বিরূদ্ধে প্রকৃত হুমকী।" (নিউজ লেটার, ১৯৮৮: ২৩)

এ বিপ-বের দু'টি নীতি হচ্ছে ঈমানের উপর নির্ভরশীল হওয়া ও শাহাদাতের কামনা। তাই পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দ্বারা সর্বাধিক নৈপুণ্যের সঙ্গে রচিত সকল ষড়যন্ত্রই এটি বানচাল করে দিয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে ইসলামি যোদ্ধাদের বিজয় এবং আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে-এর অর্থনৈতিক উন্নতি সর্বোপরি-এর চূড়ান্ড় বিজয়েরই লক্ষণ বহন করে। এসব কিছু প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের নীতি নির্ধারণকারীদের মধ্যেবেদনা তৈরি করে।

যুক্তরাষ্ট্র এবংএর বন্ধুরা নতুন ধরনের ষড়যন্ত্র রচনার পরিকল্পনা গ্রহণকরল। এসব ষড়যন্ত্রের মাধ্যেম হিসেবে তারা আন্ড়র্জাতিক আইন ও সংস্থাসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু ব্যক্তিত্ব পশ্চিমাদের নীতির সঙ্গে আঁতাত করল। আরবলিগ, আরবশীর্ষ বৈঠক, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ, ওপেক এবং নিরাপত্তা পরিষদ ইত্যাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুর"ত্বপূর্ণ মাধ্যম দ্বারা

ইসলামি বিপ-বের উপর রাজনৈতিক ও সামরিক চাপ প্রয়োগ করে। এসব ব্যবহার করেই তারা ইরানকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে কৌশলগত বিজয় লাভে বাঁধা দিচ্ছে (নিউজ লেটার, ১৯৮৮: ১৯)

পাশ্চাত্য ইরানের ইসলামিকরণ প্রতিক্রিয়ার বির"দ্ধে এমন এক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্ড়ার করেছে যার মূল অত্যান্ড় গভীরে নিহিত। তারা ইরানে একের পর এক অভ্যন্ড়রীণ সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। ইসলামি বিপ-বের বির"দ্ধে একটি দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তারা ইরানের সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। প্রথমে এই যুদ্ধকে একটি আঞ্চলিক সংঘর্ষ বলে উলে-খ করা হয়েছিল, কিন্তু যখন তারা ইরানের বির"দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে আর গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করছেনা তখনই তারা শেষ পর্যায়ের সম্মুখ সমর শুর" করেছে। তারা পারস্য উপসাগরে বহুজাতীয় সামরিক শক্তি নিয়ে এসে ইরানের সার্বভৌমকে হুমকীর সম্মুখীন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের উপর ব্যাপক অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে ইরানের ইসলামি সরকারের পতন ত্বরান্বিত করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এ জন্য তারা পারস্য উপসাগরে বৃটিশ, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সেনাবাহিনীকে প্রতক্ষভাবে কাজে লাগিয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের একটা সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য ইরানও দ্র"ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা এতে ইসলামের প্রকৃত শক্তি প্রদর্শনের একটা সুযোগ লাভ করে। ১৯৭৯ সাল থেকেই পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করে চলেছে যে, ইরানের

ইসলামি সরকার খুবই অস্থায়ী। তারা এই সরকারের জীবন কাল মাত্র ছয় মাস নির্ধারণ করে দেয় (নিউজ লেটার, ১৯৮৮: ২৮-৩৬)

ইরানে ইসলামি বিপ- বের সাফল্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ইসলামি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার এক প্রধান মিত্রকে হারিয়েছে। যে মিত্র ছিলমার্কিন নীতির বিরাজমান অনস্থা স্থিতিশীল রাখার এক নিয়ামক শক্তি ও স্বার্থের নিশ্চয়তা দানকারী। এতে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মারাত্মক সমস্যায় নিপতিত হয়। কেননা, ইসলামি বিপ- বের আগে এ অঞ্চলে ইরানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্ড়ম্ভ হিসেবে ব্যবহার করা হত। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মত অনুসারে আমেরিকার নিরাপত্তা পারস্য উপসাগরের নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই নীতি নিধার্রণের পরপরই দ্র ত মোতায়েন যোগ্য বাহিনীকে কাজে লাগানো সংক্র ড় মার্কিন সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আমেরিকার নীতি কৌশলে সামরিক উপস্থিতির উপর জোর দেয়া হয় এবং তার আঞ্চলিক উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোর সাথে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়।

ইসলামি বিপ ব সংঘঠনের ফলে আমেরিকা সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় সে ইরানের অবস্থা বিপ- বপূর্ব নীতির দিকে ফিরিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়। এ ব্যাপারে ইরানের উপর অবরোধ আরোপ অভ্য ড়রীণ সসস্ত্র গ্র পগুলোকে সমর্থন দান, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহ দান এবং ইরানের উপর ইরাক কর্তৃক প্রত্যক্ষ সামরিক হামলায় মদদ দানসহ কোনো চেষ্টাই বাদ রাখেনি। এসবই ছিলইরানের মহান ইসলামি বিপ- বকে মিটিয়ে দেয়া এবং ইসলামি শাসন

ব্যবস্থাকে উৎখাত করার এক মহাচক্রান্তের অংশ। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ব্যাপারে বর্তমান মার্কিন নীতি হচ্ছে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল থেকে ইরানকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ইরানের প্রভাব খর্ব করা। এনীতির উলে- খযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে:

১) ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা।

২) ইরানের জন্য সাহায্য মঞ্জুরী ও ঋণ বরাদ্দনিষিদ্ধকরণ।

৩) ইরানের আমদানি নিয়ন্ত্রণ।

৪) ইরান থেকে রফতানি নিয়ন্ত্রণ।

৫) ইরানের অর্থ সম্পদের উপর অব্যাহত আটকাবস্থা।

৬) পাহলভি সরকারের আমলে ক্রয় করা সরঞ্জামাদি সরবরাহে অস্বীকৃতি এবং

৭) ইরানের তেল অবরোধ।

এ সত্ত্বেও আমেরিকা তার ইরান বিরোধী সকল উদ্যেগে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। কেননা, ইরানের প্রতিশ্রদ্ধার কারণে ইউরোপ ও জাপান ইরানের প্রভাব ক্ষুন্ন করার ঐসব উদ্যোগে অংশ নেয়নি (নিউজ লেটার, ১৯৮৮ : ৪০)

(iv) মুসলমানও মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়াঃ

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইরানে ইসলামি বিপ- বের বিজয়ের পর সারা বিশ্বের মুসলমানকে জীবন যাত্রায় ক্রমশ একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মুসলমানরা নিজেদের পায়ে দাড়াঁবার চেষ্টা করছে এবং নৈতিক বলে বলীয়ান

হয়ে উঠেছে। ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এ ঘটনা যে আদর্শটি প্রতিষ্ঠা করেছে তা হচ্ছে, পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক কলুষতা ও রাজনৈতিক অনাচার থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব এবং তা বাস্ড়ব সম্মত। ১৯৬০ সালে ইমাম খোমেনী সর্ব প্রথম ইরানে একটি ইসলামি পদ্ধতির সরকার গঠনের প্রস্ড়াব করেন। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি দায়িত্ব পালনের তাগিদ সৃষ্টি কারার লক্ষ্যেই তিনি এই প্রস্ড়াব দিয়ে ছিলেন। ইমাম ইরানের জনগণকে তার এই প্রস্ড়াবের যৌক্তিকতা বোঝাতে পেরেছিলেন। তাই তারা ইসলামের পথে চলার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসেন। ১৯৭৯ সালের পর থেকে ইমাম খোমেনী বহুবার খুব সহজ ভাষায় মুসলমানদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে মুসলমানদের আত্মোপলব্ধি ঘটেছে এবং তারা ইসলামের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ইরানি জনগণের এই আত্মোপলব্দিই ইরানের মাটি থেকে সকল দুর্নীতির উচ্ছেদে তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে সংবাদ পত্রসমূহে প্রকাশিত খররে দেখা গেছে দুর্নীতিপরায়ণদের মোকাবিলা করার জন্য ইরানের নির্যাতিত জনগণ ছাত্রদের সাথে হাত মিলিয়ে অভিযান চালিয়েছে। ইরানের জনগণ শাহকে তার জাতিগোষ্ঠি ও দলবল নিয়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছিল। এ থেকেই বোঝা যায় যে, আমেরিকা তাদের রক্ষা করতে পারবে বলে বিন্দুমাত্র ধারণাও যদি তাদের থাকত তাহলে তারা কখনো দেশ ত্যাগ করত না (নিউজ লেটার, ১৯৮৮: ২৭)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় জাগরণের ফলে সংঘটিত
ইসলামি বিপ- বের সাফল্য বিশে- ষণ

২২শে বাহমানের বিপ-বের প্রেরণা সৃষ্টিকারী আদর্শিত মানদ ও নীতির আলোকে ধারণা কারা যায় যে, ইরানি ইসলামি বিপ-বের শ্রেষ্ঠতম সফলতা হচ্ছে নির্যাতিতদের তৎপরতা বিশেষ করে বিশ্বমুসলিম উম্মার প্রাণচাঞ্চল্য। আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, এমনকি দুনিয়ার সর্বত্র নির্যাতিত মুসলমান ও অমুসলমানরা নিপীড়নের বির দ্ধে ইরানের সংগ্রামকে সমর্থন করেছে (নিউজ লেটার, ১৯৮৮: ৩৪-৩৬)। ইরান এবং ইসলামি বিপ ব সকল মুসলমানের জন্য। বিষয়টি আমরা নিচের আলোচনায় আরো স্পষ্ট করার প্রয়াস পাব।

(ক) ইসলামি সত্তার পুনর ত্থানঃ

মুসলমানরা দীর্ঘ কয়েক শতক থেকে তাদের ইসলামি সত্তার পুনর ত্থানের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। ইরানের ইসলামি বিপ-বের সফলতার পূর্বে লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রত্যাশিত ইসলামি সত্তার পুনর ত্থানের জন্য প্রহর গুণছিল। সুতরাং সময় ও ভৌগোলিক এলাকার সীমায় ইসলামি বিপ-বকে অবর দ্ধরাখা সম্ভব নয়। যেহেতু এ বিপ-বের পরিচিতির ব্যপ্তি ঘটার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও গণসমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে জন্য বলা যায় যে, যদি এটি মুসলমানদের বিবেককে জয় করে এবং সঠিক নেতৃত্ব পায় তবে এটি বেগবান হবে। সুতরাং যে কোনো দেশে যে কোনো সময়ে ইসলামি বিপ ব বাস্ড়বরূপ নিতে পারে। এমনিভাবে ইমাম খোমেনীও কেবলমাত্র ইরানিদের জন্যই নন বরং দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমানদের জন্য

যাদের মধ্যে চিন্ড়ার ঐক্য আছে, সেসব ধ্যান ধারণার উৎস হচ্ছে ইসলামি শিক্ষা। এগুলো এমন সব ধারণা যে গুলোর ভিত্তি হচ্ছে অশুভ শক্তির নিপীড়ন থেকে মানুষের মুক্তি সাধন। ইরানের সাবেক শাসকচক্র যে আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহের বড় ধরনের মিত্র ছিলসেটা বিবেচনা করে বলা যায় যে, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি বিপ-ব হচ্ছে সারা দুনিয়ার বঞ্চিতদের বিপ-ব। (নিউজ লেটার, ১৯৮৮ : ৩৪)।

(খ) সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারঃ

মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে সংখ্যালঘু হিসাবে বসবাস করছে। এরা সামাজিক স্বাধীনতার নূন্যতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত। তথাকথিত ইসলামি দেশগুলোতেও অনেক ক্ষেত্রেই এমন তাবেদার শাসককূল ক্ষমতাসীন রয়েছে যাদের স্বার্থ জনতার স্বার্থের পরিপন্থী। এমনিভাবে এসব দেশের সরকারি কর্মচারীরা কেউ আমেরিকার কেউ আবার অপর পরাশক্তির দাস। এটা বাস্ড়ব সত্য যে, এসব দেশের লক্ষ লক্ষ জনতা মারাত্মক চাপের মধ্যে বিরাজ করছে। একারণেই ইরানে যখন ইসলামি বিপ-বের খাতিরে কেউ শাহাদাত প্রাপ্ত হয়, দুনিয়ার অন্যত্র, যারা ইসলামের জন্য সংগ্রাম করছে তারা সে শহীদের সম্মান ও মর্যাদা বুঝতে পারে। তেহরানের রাজপথে যখন 'আমেরিকার ধ্বংস হোক'ধ্বনি উচ্চারিত হয়, নিঃসন্দেহে সে ধ্বনি আফ্রিকা ও এশিয়ার রুদ্ধ লক্ষ কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি। কারণ মহান ইসলামি উম্মার বঞ্চিত প্রতিটি মানুষ অসাম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। যে মুহূর্তে দুর্নীতিবাজ

পাহলভিসরকার উৎখাত হল, ২২শে বাহমান ইসলামি বিপ-বের সে গর্জন দুনিয়ার অনেক দেশেইঅনুভূত হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে ইসলামি দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলরা ইসলামি উত্থানের স্রোতে যে পরিমাণে প-াবিত হয়েছে সেটা স্বীকার করতে চায়না। তাদের অন্ড়রের অন্ড়স্থলে এটা অনুভূত হয়েছে যে, নির্যাতনকারীর বির"দ্ধে ইরানের বিজয়ের স্রোত ইরানের সীমানা অতিক্রম করে তাদের নিজ নিজ ভৌগোলিক পরিসীমায় উপস্থিত হয়েছে। ইসলামি জাগৃতির ভয়ে এবং জনতার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে নিপীড়ক যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত শাসকরা ইরানের ইসলামি বিপ-বের সঙ্গে তাদের জনতার হৃদয় যোগ সাধিত হওয়ার বিষয়টা অস্বীকার করার চেষ্টা করে। (নিউজ লেটার, ১৯৮৮ : ৩৫)।

(গ) আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্তিঃ

দুনিয়ার প্রায় সকল নির্যাতিত জাতির ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই ইসলামি বিপ-বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যদিও কঠোরতার সঙ্গে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তথাপি মিশরের সরকার এটি লুকিয়ে রাখতে পারেনি যে, ইরানের ইসলামি বিপ–বের প্রেরণা থেকেই সেখানকার মুসলমানরা বৈপ-বিক চেতনাসহ সাদাতকে হত্যা করেছে। আয়াতুল–াহ খোমেনীকে আদর্শ নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে মিশরের মুজাহিদরা বার বার ঘোষণা দিয়েছে।

পশ্চিম সাহারার সংগ্রাম ও ইরানি জাতির বিজয় থেকেই এ অনুপ্রেরণা পেয়েছে। এসব প্রত্যয়দীপ্ত যোদ্ধারা প্রমাণ করেছে যে, আত্মপ্রত্যয় ও চিন্ড়ার ঐক্য থাকলে উপনিবেশবাদী শক্তি যতই সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হোক না কেন তাদেরকে পরাভূত করা সম্ভব।

ফিলিস্ড়ীনীরা গভীর ঘৃনার সঙ্গে তাদের মাতৃভূমির দীর্ঘ একাত্তর জায়নবাদী জবর দখলের বিরূদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে তারাও ইরানের ইসলামি বিপ-ব থেকে শক্তি সংগ্রহ করছে। বহিঃশক্তির দ্বারা আফগানিস্ড়ান জবর দখলের দীর্ঘ সময় অতিক্রম হওয়ায় আফাগানরা এখনও তাদের স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনেইরানি মুসলমান ভাইদের নিকট থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমর্থন যুগিয়ে থাকে। এমনকি মুসলমান সংখ্যালঘুরাও নিজ নিজ দেশে আজ নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে দাবি তুলতে ভীত হচ্ছেনা। মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ দিনের নিদ্রা ত্যাগ করে জেগে উঠেছে এবং দুশমনদের বিরূদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করেছে দেখে তারা ও নিজেদের ইসলামি সত্তা হিফাজতের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, যদিও তাদের বিরূদ্ধে নির্যাতন চলছে। (নিউজ লেটার, ১৯৮৮ : ৩৫-৩৬)।

(v) ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার গোড়াপত্তনঃ

ইরানের ইসলামি বিপ–ব সাফল্যমন্ডিত হওয়ার পর দেশের অন্যান্য খাতের ন্যায় ব্যাংকিং খাতেও সাফল্যের দিগন্ড় উন্মোচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক

ব্যবস্থায় ব্যাংকের গুর"ত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু বিশ্বের পুঁজিবাদী সমাজে সাধারণ মানুষের পুঁজি পুঞ্জীভূত করে ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে পুঁজিপতিরা অর্থের পাহাড় গড়ে তুলে। আর সাধারণ গ্রাহকরা হয় বঞ্চনার শিকার। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ইসলামের অর্থনীতি ব্যবস্থার আলোকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন ছিলএকান্ড়ই জর"রি। বিপ- বোত্তরকালে ইরানে সে ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়। বিপ- ব বিজয়ের পরেই ইরানের ইসলামি সরকার ব্যাংক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে সুদবিহীন (রেবা) ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। আর এ ব্যবস্থার অধীন ইরানি ব্যাংকগুলো জনকল্যাণে নিয়োজিত হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। আর আন্ড়র্জাতিকভাবে ইসলামি ব্যাংকিং চালু ও-এর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ইরান প্রতি বছরই 'ইন্টারন্যাশনাল কোর্স ইন ইসলামিক ব্যাংকিং' শিরোনামে একটি কোর্স চালু করেছে যাতে বিভিন্ন দেশের ব্যাংক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ইরানের মজলিসে শুরায়ে ইসলামি পার্লামেন্ট ১৯৮৩ সালের ৩০ আগস্ট সুদবিহীন ব্যাংকিং আইন পাস করে যা- ২ দিন পর অর্থাৎ একই সালের ১সেপ্টেম্বর অভিভাবক পরিষদ অনুমোদন করে। সে থেকেই ইরানের সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম সুদবিহীন এবং ইসলামি শরীয়ার আলোকে পরিচালিত হয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইরানের (Bank Markzi Iran) তখন থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান (Bank MarkziyeaJamhoriyea Islamiyea Iran) নামে অভিহিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তেহরানের পাসদারান এভিনিউতে

অবস্থিত। বর্তমানে দু'দেশের অধিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর উলে- খযোগ্য কয়টি হল নিম্নরূপ:

(১) ব্যাংকে তেজারত।

(২) ব্যাংকে মিল- াত।

(৩) ব্যাংকে মিলি- ।

(৪) ব্যাংকে সেপাহ।

(৫) ব্যাংকে মাযকান।

(৬) ব্যাংক ফর ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড মাইন।

(৭) দি এগ্রিকালচারাল ব্যাংক।

(৮) এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক।

(৯) ব্যাংকে সোদারত।

(১০) ব্যাংকে রেফাহ।

এছাড়াও বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ব্যাংক রয়েছে সবগুলো ব্যাংকই ইসলামি শরীয়াতের নীাতমালার আলোকে জমা গ্রহণ এবং বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। ব্যাংকগুলো কারর্জে হাসানা এবং লাভ লোকসানের ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে থাকে।

এবং ৯টি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে:

১। কারজে হাসানা

২। কিস্ড়িতে বিক্রি

৩। অগ্রিম ক্রয়

৪। সাধারণ অংশীদারিত্ব

৫। মুদারাবা

৬। হায়ার পারচেজ

৭। আইনগত অংশীদারিত্ব

৮। মোশাকাত

৯। সরাসরি বিনিয়োগ

ব্যাংকগুলো এসব বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে যাচ্ছে এবং ইসলামি শরীয়তের বিধান মোতাবেক বিনিয়োগ করে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ সকল সেক্টরে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দেশের ভিতরে সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রেখেই দেশটি ক্ষান্ড় হয়নি। আল-াহর কালিমাকে সারাবিশ্বে সুপ্রিতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং 'আল-াহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর রেবাকে করেছেন হারাম।' আল–াহর এই নির্দেশকে সফলভাবে সারাবিশ্বে প্রদর্শন করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল আন্ড়র্জাতিক ইসলামিক ব্যাংকিং টেনিং কোর্স প্রবর্তন।

১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ড় সাতের অধিক এ জাতীয় কোর্স পরিচালনা করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, লেবানন, মালয়েশিয়া, নাইজেরীয়া, পাকিস্ড়ান, সিরিয়া, আলজেরিয়া, জার্মানী, ভারত, ইরান, ওমান, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আজারবাইজান, জর্দান, কাজাকিস্ড়ান, কুয়েত,

ফিলিপাইন, সুদান, তুর্কমিনস্ড়ন, ইয়েমেন, উজবেকিস্ড়ন, আর্মিনিস্ড়ন, কাতার এবং আফগানিস্ড়নের মোট ১৬৮ জন বিশিষ্ট ব্যাংকার এসব কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। যারা অনেকেই এখন বিভিন্ন দেশে ব্যাংকিং আন্দোলনের সিপাহসালার, এমনকি ভারত, ফিলিপাইন, এবং জার্মানীর ন্যায় অমুসলিম দেশের ব্যাংকারগণও ইরানে অনুষ্ঠিত ইসলামিক ব্যাংকিং কোর্সে অংশগ্রহণ করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান এবং ইসলামিক ব্যাংকিং সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করেছেন। এ ছাড়াও দীর্ঘদিন যাবত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক শাসনের অধীনে মুসলিম দেশসমূহের প্রশিক্ষনার্থীগণ বিশেষ করে আজারবাইজান, কাজাকিস্ড়ন, তুর্কেমিনিস্ড়ন, উজকেকিস্ড়ন, আর্মেনিস্ড়ন প্রভৃতি দেশ থেকে ইরানে প্রশিক্ষণ নিতে এসে ইরানের মধুময় ইসলামি সমাজ এবং ইসলামিক ব্যাংকিং সম্পর্কে বাস্ড়ব ধারণা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ নিজ দেশে অনুশীলনের দৃঢ় শপথ নিয়েছেন।

ইসলামিক ব্যাংকিং আন্দোলনকে শুধুমাত্র ইরানে সীমাবদ্দ না রেখে সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি অংগ সংগঠন ইরান ব্যাংকিং ইনস্টিটিউট নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট যিনি একজন আইনের অধ্যাপকও বটে ড. সাইয়্যেদ মেহদী ইরানি তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ড. সাইয়্যেদ আলী আসগার হেদায়াতী, জনাব ইয়ামেরীসহ টিমটি অত্যন্ড় আন্ড়রিকতার সাথে যে রূপ অক্লান্ড় পরিশ্রম করেযাচ্ছে তাতে

মনে হয় আগামী শতাব্দী ইসলামি ব্যাংকিং-এর শতাব্দী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হবে (নিউজ লেটার, ১৯৮৮: ৩৮-৩৯)

(vi) সালমান রুশদীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণাঃ

সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনীর মৃতুদন্ডাদেশ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা- যা ইসলামি বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিপুল সংখ্যক লোক বিশেষ করে ব্রাডফোর্ডে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৃটিশ লেখক সালমার রুশদীর লিখিত ‘স্যাটানিক ভার্সেস’-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। ইংল্যান্ডের আদালতে ‘স্যাটানিক ভার্সেস’-এর প্রকাশনা বন্ধ করার প্রয়াস সফল না হওয়ায় ভারত ও পাকিস্তানে বিক্ষোভ সংঘটিত হয় এবংএর ফলে ৭০ থেকে ৮০ জন লোক নিহত হয়। বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ইমাম খোমেনী (র.) এক ফতোয়া জারি করে রুশদীকে মুরতাদ বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন ইসলামের নবীর প্রতি অবমাননাকর লেখার জন্য রুশদীকে হত্যা করা মুসলমানদের জন্য ফরয। ‘স্যাটানিক ভার্সেস’ প্রকাশ করে পাশ্চাত্য দেশগুলো অথবা সম্ভবত ইয়াহুদি গোষ্ঠী মুসলমানদের অনুভূতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে চেয়েছিল। ইমামের ফতোয়া জারির পরে পাশ্চাত্যের সমর্থনে যে চ্যালেঞ্জ ও সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে ইমাম খোমেনী অভিমত প্রকাশ করেন যে, ঐ

পুস্ড়কটি শুধুমাত্র শত্র"পক্ষ লিখিয়েছে তাই নয়, বরং মুসলমানদের বির"দ্ধে একটি নতুন রাজনৈতিক অভিযান ও বটে যা ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদার জন্য হুমকি স্বরূপ। ইমাম খোমেনী বলেন, শুর"তেই এই চক্রান্ড়কে প্রতিহত করতে হবে।

ইমাম খোমেনী (র.) ফতোয়া দেয়ার কারণে ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হন। তাঁকে পাশ্চাত্য বিরোধী একজন মৌলবাদী নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই ঘটনা ইউরোপীয় দেশগুলোতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইরানে নিযুক্ত ইউরোপীয় দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতদের ডেকে পাঠানো হয়। অবশ্য ইমামের ফতোয়া মুসলিম বিশ্বের সমর্থন লাভ করে এমনকি ও.আই.সি. নিশ্চিত করে যে র"শদী একজন ধর্মদ্রোহী। ফতোয়ার ব্যাপারে ইমাম খোমেনীর অনড় মনোভাবের ফলে পাশ্চাত্যের আরেকবার পরাজয় ঘটে এবং রাষ্ট্রদূতরা সবাই তেহরানে ফিরে আসে। (নিউজ লেটার, ২০০১ : ২৪)।

(vii) ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্ড়রঃ

১৩৫৭ ইরানি সালের ২২ বাহমান (১১ই ফেব্র"য়ারি ১৯৭৯ খ্রি.)। হযরত ইমাম খোমেনী (র.) এ দিনটিকে আল-াহ প্রদত্ত বিশেষ দিন হিসাবে অভিহিত করেছেন। সব দিনই আল"াহর দিন। কিন্তু এ দিনটির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে কারণে হযরত ইমাম (র.) বিশেষভাবে এ দিনটিকে আল-াহর দিন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এদিনটি হচ্ছে ইরানের ইতিহাসে

এক পবিত্র দিন এবং ইসলামের ইাতহাসে একটি গুর"ত্বপূর্ন দিন। এ দিনে একটি মুসলিম জাতি খালি হাতে এবং কোনো বৈদেশিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই কেবল আল-াহ তায়ালার ওপর ভরসা করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দেশ ইরানের বুক থেকে আমেরিকার চাপিয়ে দেয়া পুতুল সরকারকে উৎখাত করে। এদিনই বিশ্বের বুকে একটি প্রকৃতইসলামি প্রজাতন্ত্র কায়েম হয় (নিউজ লেটার, ২০০১: ১৩)।

ঐতিহাসিক ১৯৭৯ সালের ১ ফেব্র"য়ারি ইসলামি প্রজাতন্ত্রের জনক ১৫ বছর নির্বাসনে থাকার পর স্বদেশে প্রত্যাবতর্ন করেছিলেন। সেদিন তাকে স্বাগত জানানোর জন্য এমন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলযা ছিলবিশ্বে অতুলনীয়। তিনি বিশ্বের সমীকরণ পাল্টে দিয়েছিলেন। ইমাম খোমেনী মানব মনের সৃষ্ট ত্রুটিপূর্ণ অশুভ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ঐশী প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে একটি সমাজ বাস্ড়বে রূপদান করেন। হঠকারী ফরাসি বিপ-বের নাস্ড়িক ধারণার বিপরীতে ইসলামের কল্যাণমুখী দৃষ্টিভংগির আবির্ভাব ঘটে।

ইরানে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছেএবং বিশ্ব ইসলামি সরকার পদ্ধতির রূপায়ন ঘটেছে, কিন্তু তা কোনো তৃতীয় শক্তি নয়, বরং তা মানব সমাজের সবচেয়ে অকাট্য ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশাসন। এটা এতই গতিশীল যে বিশ্বের মজলুম মানুষের আদর্শ হয়ে উঠেছে। একইসাথে সমগ্র মুসলিম জগতে এবং ইউরোপ আমেরিকার রাজপথ ছাপিয়ে 'আল–াহু

আকবার' ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে। ইমাম খোমেনী মানুষের সুপ্ত তেজস্বিতাকে বিপ-বে রূপদান করেন এবং বিজয় উত্তরকালে ইসলামের শত্রুদের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের মুখেও একটি ইসলামি সমাজব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্ড়র স্থাপন করেন।

ইমাম খোমেনীর দূরদর্শিতা ও দূরদৃষ্টির ফলে যে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ৪০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলতা আজ শুধু ৫৭ রাষ্ট্র সম্বলিত ও আইসির নেতৃত্বই দিচ্ছে না, বরং তার প্রস্ড়াবের ভিত্তিতে ২০০১ সালের খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারকে "আন্ড়ঃসভ্যতা সংলাপের বছর" হিসেবে জাতিসংঘে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়েছে (নিউজ লেটার, ২০০০: ১৬-১৮)।

(viii) আলকুদস দিবসের প্রবর্তন:

ইমাম খোমেনী (র.) কতৃর্ক আল কুদস দিবস পালনের পটভূমি অনেকেরই জানা আছে। আল-কুদস বা জের"জালেম হচ্ছে মানব সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র। শুধুমাত্র ইসলাম নয় অন্যান্য একত্ববাদী বিশ্বাসী মানবগোষ্ঠীর কাছেও এই নগরীর পূতপবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্য ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এই পবিত্র স্থানে রয়েছে মুসলমানদের প্রথম পবিত্র কেবলা বায়তুল মোকাদ্দোস বা মাসজিদুল আকসা। এই পবিত্র শহরটি মুসলমানদের দখলে আসে ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধে। এরপর শত শত বছর ধরে বিশ্বের সমস্ড় প্রতিক্রিয়াশীল ও ষড়যন্ত্রকারী শক্তির প্রত্যক্ষও পরোক্ষ আগ্রাসনের মাধ্যমে সৃষ্ট ইয়াহুদি বাদী রাষ্ট্রের জবর দখলের মাধ্যমে আল

কুদসসহ জের"জালেম ছিনিয়ে নেয়া হয় মুসলমানদের কাছ থেকে। সেই থেকে পবিত্র আল কুদস এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমানের ভাগ্য ইয়াহুদিবাদী আগ্রাসী শক্তির বিষাক্ত ছোবলে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়ে যায়।

অভ্যন্ড়রীণ ও বহি:শত্রুর ষড়যন্ত্রের কারণে ফিলিস্ড়ীনী মুসলমানসহ প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরাইলের হাতে পরাভূত হতে থাকে। ফিলিস্ড়ীনীরা নিজেদের বার বার সংঘটিত করার চেষ্টা করলেও নেতৃত্বের দুর্বলতা, আপোষকামিতা, বৃহৎ শক্তির ষড়যন্ত্র ও তথাকথিত মুসলিম শাসকদের কায়েমী স্বার্থের কারণে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। একদিকে মুসলমানদের রক্ত ঝরছিল, নারী ও শিশুদের আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছিলো, মায়ের বুক খালি হচ্ছিল, আর অন্যদিকে আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে ইসরাইল পৃথিবীর আধুনিক সামরিক শক্তির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নিজেকে তৈরি করে ফেলেছিল। এমনি এক নাজুক ও অসহায় পরিস্থিতিতে মহান নেতা ইমাম খোমেনী (র.) ঘোষণা করেন:

ইমামের এই ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইরানসহ অনেক মুসলিম দেশ এই দিবসটি পালন করে আসছে। ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্র"য়ারি ইসলামি বিপ-বের পরপরই ৭ আগস্ট এক ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে ইরানে ইসলামি বিপ-বের মহান নেতা আয়তুল-াহ খোমেনী (র.) সারা বিশ্বের প্রতি এই দিবস পালনের মাধ্যমে আল কুদস মুক্ত করার জন্য ইসলামি উম্মাহর প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

বিশ্বের সমস্ড় মুসলমানদের এ চরম সংকটের সময় আমি দাওয়াত দিচ্ছি তারা যেন ইসরাইল ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। তাঁরা যেন লাইলাতুল কদরের মাস পবিত্র রমজান মাসের শেষ শুক্রবারকে 'কুদস দিবস' হিসেবে পালন করে। এদিনই হয়তো ফিলিস্ড়ীনী জনতার ভাগ্য নির্ধারণে সহায়ক হবে। মুসলমানদের উচিত ফিলিস্ড়িনের মুসলিম জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে দিবসটি পালন করা। মহান আল-াহপাকের দরবারে ইহুদিদের উপর মুসলমানদের বিজয় কামনা করছি। (ছামিরউদ্দিন, ১৯৮৮: ৩৩)

❑ ইরানের ইসলামি বিপ-বের সাফল্যের ভিত্তিঃ

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেক কাজের জন্য এক-একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও ধরন রয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসারে কাজ করলে, তা সহজে ও অল্প সময়ে সম্পাদিত হয়। একটি বিপ্লব সম্পাদনও এই নিয়ম বহির্ভূত নয়, আজ পর্যন্ড় কোনো বিপ-ব এ নিয়মের বাইরে সম্পাদিত হয়নি। একটি বিপ-ব নতুন মাপকাঠি নিয়ে আসে। এ জ্ঞান বিরাজিত পদ্ধতিকে নিখুঁত করতে সাহয্য করে। ইরানের ইসলামি বিপ-ব এরই পাশাপাশি পদ্ধতির ক্ষেত্রে এক বৈপ-বিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। হযরত মূসা, ঈসা (আ.) ও ইসলামের পয়গম্বরের বিপ-বসমূহ ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিপ-ব ইরানের ইসলামি বিপ-বের সাথে তুলনীয় নয়।

বিপ-ব সশ্রদ্ধভাবে সংঘটিত হয় অথবা বিশ্ব শক্তিবর্গের ওপর নির্ভর করে ঘটে থাকে বিশেষ করে সাম্প্রতিক শতাব্দীসমূহে সংঘটিত কোনো

বিপ-বই এদুটি নিয়মের লংঘন করে সংঘটিত হয়নি। কোনো বিশ্ব শক্তির বির"দ্ধে ক্ষুদ্রতর দেশসমূহ বিপ-ব শুর" করলে, যেসব দেশ সাধাণত ঐ বিশ্ব শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সমর্থন গ্রহণ করে। সামরিক শক্তি ও পর্যাপ্ত সরঞ্জাম বিশিষ্ট বৃহত্তর দেশসমূহ রাজনৈতিক শিবিরগুলো বিপ-ব সংঘটিত করার ক্ষেত্রে অস্ত্রের ওপর নির্ভর করেছে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর র"শ বিপ-ব সংঘটিত করার ক্ষেত্রে অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে বিজয় অর্জন করেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো রাশিয়ার সমর্থনে বিপ-ব করেছে, আর যোগ দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে। কোনো দেশ সমাজতান্ত্রিক শিবির ছেড়ে পুঁজিবাদীশিবিরে যোগ দিয়ছে পুঁজিবাদী শক্তির ওপর ভর করে। এসব বিপ-ব সরকার ও অর্থনেতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনলেও নিজেদের জনগণকে পাল্টাতে পারেনি। উদাহরণ হিসেবে আলজেরিয়ার কথা উলে-খ করা যায়। বিপ-বী দেশসমূহের মধ্যে এ দেশটি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। ফরাসি আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আসার পরে আলজেরিয়া সমাজতন্ত্রমুখী পরিবর্তন আনে এবং সেখানে আমলাতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। আদর্শগত কারণে এটা হয়ে থাকে। তথাপি ফ্রান্সের থেকে স্বাধীনতা প্রপ্তির পর আলজেরীয় জনতা ইসলামের প্রতি গভীর প্রেম থাকা সত্ত্বেও নিজেদের কর্ম ও সংস্কৃতির প্রাথমিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত। আলজেরীয়ায় চিঠিপত্রে, যোগাযোগ, আমলাতান্ত্রিক কাজও শিক্ষার সরকারি ভাষা ফরাসি। এখনো ফরাসি ভদ্রতা, নিয়ম, কানুন, আনুষ্ঠানিকতা ও সংস্কৃতি সে দেশের জনগণের জীবনে প্রভাব বিস্ড়ার করে রয়েছে। অন্যান্য বিপ-বের ন্যায় আলজেরীয় বিপ-বও এক বৃহৎ শক্তি থেকে মুক্ত হতে আরেক বৃহৎ শক্তির

ওপর নির্ভর করেছিল বলেই এমন হয়েছে। এ বিপ- বের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি তবে উপনিবেশিক সংস্কৃতি থেকে নয়। (Muhajeri, 1983 : 32)

ইরানে ইসলামি বিপ- ব এসব পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করে নির্ভর করেছে এমন এক পদ্ধতির ওপর, যে পদ্ধতির উদাহরণ আল- াহর পয়গম্বরদের বিপ- বে ছাড়া অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। বিশ্বের অন্যসব বিপ- ব থেকে এখানেই ইরানের ইসলামি বিপ- বের পার্থক্য। পয়গম্বরগণ অর্থনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, মানুষের অন্ড়র পরিবর্তনের জন্য বিদ্রোহ করেছিলেন। আর অর্থনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সাধিত হয় মানুষের মানসিক পরিবর্তন অনুসরণ করেই। এভাবেই ইসলামের নবী-তাঁর সুসংগঠিত বিপ- বকেসুসংগঠিত করার জন্য যেমন রোম বা পারস্যের ওপর নির্ভর করেননি, ঠিক তেমনি ইরানের ইসলামি বিপ- ব ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হতে সমাজতন্ত্রের পদমূলে নিজেকে সমর্পণও করেনি। (Muhajeri, 1983 : 33)

ইরানের ইসলামি বিপ- ব আল- াহতালার আনুগত্য ও জনগণের সেবার জন্য এক পরিপূর্ণ ও নতুন জীবনধারা অনুসরণের আহবান জানায়। এই বিপ—ব ইসলামি মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার কথা বলে। কারণ, নেতিবাচক পশ্চিমা মূল্যবোধও প্রভাব ইরানের জীবন ধারার উপর এক অবক্ষয় সৃষ্টি করেছিল। ইরানি বিপ- ব জনগণর কাছে যে বাণী পৌঁছে দিয়েছিল তা ছিল ধর্মীয় আবরণ

সমৃদ্ধ। এই বিপ-বের জন্য ইমামের কাছ থেকে যখন বিদ্রোহের আহবান আসলো তখন পৃথিবীর কোনো শক্তিই তা র"খতে পারলো না। এই বিপ-বের ধর্ম-বিশ্বাসভিত্তিক আবেদন স্বয়ং জনসাধারণের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতাকে নিশ্চিত করে।

ইরানের এই বিপ-ব যেহেতু সুস্পষ্টভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার উপর ভিত্তি করে গোটা জীবন ধারাকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন, তাই তার শেকড় একেবারে গভীরে প্রোথিত। এ কারণেই এই বিপ-ব বিশ্বের অন্যান্য স্থানে সংঘটিত বিপ-বের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই বিপ-বের লক্ষ্য যতটা না মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষের আধ্যাত্মিকতার। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ঘটনাক্রমে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে এবং ভাগ্য বিড়ম্বনায় সে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দার মতো হয়ে পড়তে পারে। পক্ষান্ড়রে আধ্যাত্মিকতা অবলম্বনকারীর জান্নাত নিশ্চিত হতে পারে। (Muhajeri, 1983 : 33)

যে জনগণকে বশীভূত করার জন্য উপনিবেশবাদীরা ৫৭ বছর যাবত চেষ্টা করেছে, সে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে ইমামের বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও অদ্বিতীয় গতিময়তা। (নিউজ লেটার, ১৯৯৭ : ১৯)

ইমামের জীবনী ও বৈশিষ্ট্য

বিপ-বের নেতা ইমাম খোমেনী (রহ.) ছিলেন একক মননশীলতার অধিকারী। তিনি খোদায়ী আদর্শ ও চেতনায় উদ্দীপ্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও অটল ন্যায়পরায়ন। ইসলামের জন্য তিনি ছিলেন পুরোপুরি নিবেদিত প্রাণ। দুশমনদের ক্ষমতা, প্রভাব ও সামরিক সম্ভারে তিনি মোটেই বিচলিত হতেন না এবং তাদের প্রতি বিমুগ্ধ ও হতেন না। যে কোনো মানুষের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন তিনি, কিন্তু কাউকেও দেখে ভীত হননি। তিনি শত্র“র মোকাবেলা করতেন অত্যন্ড় দৃঢ় ও স্থির সংকল্প নিয়ে, যে কারণে শত্র“র গতিবিধি তিনি সহসাই বুঝতেন। তিনি তার ক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অত্যন্ড় সমৃদ্ধ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ বৃদ্ধি কখনই তার কাছে বিবেচ্য বিষয় ছিল না। ইসলামি বিপ-বের নেতৃত্বে নিজেকে সবসময় সমাজের অবহেলিত শ্রেণির একজন মনে করতেন এবং কখনই নিজের জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবধিা প্রত্যাশা করেননি। এর বিনিময়ে নেতৃত্ব আর বিপ-বের অনুকূলে প্রায় ব্যাপক গণসমর্থনলাভ করেন। তিনি ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বিশেষে বিশ্বের সকল অবহেলিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। এই অনন্য সাধারণ নেতৃত্বই ইসলামের আদর্শ কায়েমের জন্য জনসাধারণকে ত্যাগের আহবান জানায় এবং চূড়ান্ড় বিজয় ছিনিয়ে আনে। অন্যাত্মবাদের শক্তিই শেষ পর্যন্ড় ইরানে ইসলামি বিপ-ব

সফল হওয়ার নিশ্চিয়তা বিধান করে, অবশ্য যদিও তা উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে। (আমিন আল আসাদ, ১৯৯৭ : ২০)

❑ বিশ্ব পরিমন্ডলে-এর প্রভাবঃ

ইরানের ইসলামি বিপ- ব সফল হওয়ার অব্যবতিপরই পূর্ব এশিয়া থেকে ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ড় তথা বিশ্বের সর্বত্র ইসলামি বিপ- বের বিস্ময়কর প্রভাব নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ডেও ইসলাম মানব সমাজের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। ইসলামি বিপ- বের মোকাবেলায় পাশ্চাত্য সমাজ সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রচার ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে চলছে। এর কারণ, ইসলাম কোনো চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মীয় চিন্ড়াধারা পুনরুজ্জীবনে-এর মর্মবাণী ছড়িয়ে যাচ্ছে সীমান্ড়ের পর সীমান্ড় পেরিয়ে। (নিউজ লেটার, ১৯৯৭ : ১৮)

ইসলামি বিপ- ব সাফল্যমন্ডিত হওয়ার পূর্বের শতকে মুসলমানদের অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। এ সময়ে মুসলমানরা ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট। মূলত মুসলমানদের অধঃপতন শুরু হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে বৃটেন কর্তৃক মিশরের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। এরপর থেকে বৃটিশরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্ড়ার করে। যদিও ইরনে সে সময় স্বাধীন ছিল কিন্তু সে দেশের ক্ষমতাসীনরা তাদের ক্ষমতা ও রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য

পরাশক্তিগুলোর তাবেদার হয়ে কাজ করার ফলে এ জাতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোও পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তারা কেবল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্ড় ারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পাশ্চাত্য মূল্যবোধের দ্বারা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সম্মোচিত ও আবিষ্ট করতে প্রয়াস চালিয়েছিল। ইরানের খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক জালাল আলে আহমাদ মুসলিম মেধা ও মননের উপনিবেশীকরণকে 'গারব যাদেগী' বা পাশ্চাত্য-ম্যানিয়া বলে আখ্যায়িত করছেন-যা মুসলমানদেরকে অবক্ষয় ও ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গেছে। এককভাবে ইউরোপীয়রাই মুসলমানদের ওপর প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য আধিপত্য বিস্ড়ার করেনি, এদের সাথে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নও একত্র হয়েছিল। এ সকল উপনিবেশবাদের কৌশল ও লক্ষ্য ছিল নব্য উপনিবেশবাদ গঠন, যাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণাকে সঠিক ও উন্নত বলে প্রতিষ্ঠিত করা। এ উপনিবেশবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদের দ্বারা মুসলমানদের অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং মুসলমানরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। (নিউজ লেটার, ১৯৯৭ : ১৮)

মুসলিম বিশ্ব তথা মুসলমানদের এহেন অবনতিশীল পরিস্থিতিতে ইরানে বিংশ শতকের সবচেয়ে আলোচিত ও গুর"ত্বপূর্ণ ইসলামি বিপ- ব সংঘটিত হয়- যা সকল প্রকার বিরূপ ও প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবেলায় ইসলামের শাশ্বত বিধান প্রতিষ্ঠায় সফলতা অর্জন করে। পূর্বেই উলে- খ করেছি যে, এ

বিপ□ব এমনি এক সময়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে যখন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ অসহায় ও ছোট ছোট দেশ ও জাতিগুলোর ওপর দোর্দণ্ড প্রতাপ চালিয়েছিল।

একটি বিপ- ব তখনই সাধিত হয় যখন সে দেশের জনগণ তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা নির্যাতিত হয়ে অসহায়ত্বের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকে। তাদের ভোগ-বিলাস ও পরাশক্তির দাসত্বের ফলে দেশের মৌলিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। এহেন পরিস্থিতি যখন দেশের আনাচে কানাচে বিস্তার লাভ করে ঠিক তখনই জনগণ এক বৈপ- বিক তথা আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হতে থাকে এবং একটি চূড়ান্ত ও অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা করে।

আমরা জানি যে, একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি বিপ- ব সংঘটিত, সাফল্যমণ্ডিত ও চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা কোনো শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়।

জাতিসমূহের জাগরণে ইসলামি বিপ- বের প্রভাব

জাতিসমূহের জাগরণে ইসলামি বিপ- বের প্রভাবের কথা আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই নির্বিশেষে বিশ্বসমাজের প্রতি ইমাম খোমেনী (র.)-এর আহবান ও আমন্ত্রণের কথা স্মরণ করা দরকার। এ প্রসঙ্গে আমরা তাঁর একটি ঐতিহাসিক পত্রের কথা বলতে পারি। ইমাম ১৯৮৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রিম প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান ও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভের নিকট একটি বাণী প্রেরণ করেন। ইরানের

বিশিষ্ট আলেম এবং চিন্ড্রাবিদ আয়াতুল-াহ জাভাদ আমুলীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল তাঁর বাণীটি নিয়ে মস্কোতে গমন করেন এবং গর্ভাচেভকে তা পাঠ করে শোনান, পরিশেষে এটি তাঁর হাতে হস্ড্রান্ড্র করেন। এই বাণীটি একটি ঐতিহাসিক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাণীর এক স্থানে তিনি (ইমাম) বলেন:

> *জনাব গর্ভাচেভ! সত্যের দিকে সবারই প্রত্যাবর্তন করা উচিৎ। ব্যক্তি মালিকানা, অর্থনৈতিক (সমস্যা) ও স্বাধীনতা (হীনতা) আপনাদের প্রধান সমস্যা নয়। এটি হচ্ছে সত্যিকারের খোদা বিশ্বাসের অনুপস্থিতি। সেটি এমন এক সমস্যা যা পাশ্চাত্যকে অশ-ীলতা ও সামাজিক অচলাবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে বা ভবিষ্যতে সে পথে ঠেলে দিবে। সকল সত্তা ও সৃষ্টির উৎস যে খোদা তার বির"দেধ দীর্ঘ ও অর্থহীন সংগ্রামই আপনাদের প্রধান সমস্যা।*
>
> *জনাব গর্ভাচেভ! এটা আজ সবার নিকট সুস্পষ্ট যে, এখন থেকে কম্যুউনিজমকে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের জাদুঘরগুলোতে খোঁজ করতে হবে। কেননা, মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজনের ব্যাপারে কোনো সদুত্তর মার্ক্সবাদে নেই।* (নিউজ লেটার, ২০০৯ : ২৬-২৭)

আমরা এখানে তাঁর বাণীর সামান্য উদ্বৃতি উপস্থাপন করলাম। হ্যাঁ, -এর মাত্র এক যুগ পরেই তথা ১৯৯১ সালে তার পতন ঘটে। তাসের ঘরের মতো এই বৃহৎ সোভিয়েট ইউনিয়ন উড়ে যায় এবং এরই ফলে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সৃষ্টি ১২টি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র-যেগুলো নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি

কমনওয়েলথ তথা Commonwealth of Independent States (CIS)। এগুলো হচেছ আযারবাইজান (Azerbaijan), আরমেনিয়া (Armenia), বেলার"স (Belarus), জার্জিয়া (Georgia), কাজাকিস্ড়ান (Kazakhstan), কিরখিজিস্ড়ান (Kyrgyzsan), মোলডোভা (Moldova), রাশিয়া (Russia) তাজিকিস্ড়ান (Tajikistan), তুর্কিমিনিস্ড়ান (Turkmenistan), উযবেকিস্ড়ান (Uzbekistan), এবং ইউক্রেন (Ukraine)। (তারিক, ২০১৪ : ১৬)

এই রাষ্ট্রগুলোর সাথে সহসাই সৃষ্টি হয় ইরানের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত গভীর সম্পর্ক যা পূর্বে সম্ভব ছিল না এবং এসব রাষ্ট্রের জনগণ ইরান ও ইরানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি বিপ- বের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। আমেরিকা শত চেষ্টা করেও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কোনো প্রকার চির ধরাতে পারেনি এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে।

সালমান র"শদি কর্তৃক আমাদের প্রিয় নবী মহাম্মাদুর রাসুলুল- াহ সম্পর্কে অশোভন ও আপত্তিকর উক্তির প্রতিবাদে ইমাম খোমেনী (র.) যে ঐতিহাসিক ফতোয়া দিয়েছিলেন তাঁর প্রভাব বিশেষ করে মুসলিম এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বে পড়েছিল যা ইসলামি বিপ- বের প্রভাবেরই নামান্ড়র বলা চলে। উলে- খ্য, ১৯৯৮ সালে ইয়াহুদিবাদী আন্ড়র্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা ভাইকিং পেঙগুইন র"শদীর *The Stanic Verses* (শয়তানের পদাবলি) নামক বইটি প্রকাশ করে। ইমামই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার বির"দ্ধে

মৃত্যুদ"াদেশ জারি করেছিলেন- যা এখনো বলবৎ রয়েছে। উপরন্ড় তার বইটিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।

একইভাবে ইসলামি বিপ-বের প্রভাব পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো তথা চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও পড়েছে। হংকং থেকে মুসলিম হ্যারাল্ড ইন্টারন্যাশনাল নামক ইংরেজি ও চীনা ভাষার মিশ্রণে প্রকাশিত একটি পত্রিকা এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে এবং এখনও রাখছে। অনুরূপ পত্রপত্রিকা ব্যাংকক থেকেও বের হচ্ছে। এছাড়া ভারত, পাকিস্ড়ান এবং বাংলাদেশ থেকে অনেক পরিশীলিত ও গঠনমূলকপত্র পত্রিকায় ইসলামি আদর্শ ও সংস্কৃতির রূপায়নে কাজ করে যাচ্ছে- যা বিপ-ব পূর্বকালে কল্পনাও করা যেতনা। মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ গঠনে এসবের একটি সুদূর প্রসারী ভূমিকা ও প্রভাব রয়েছে। (নিউজ লেটার, ২০০৯ : ২৬-২৭)

ইরানের এই বিপ-বের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে। আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, ফিলিস্ড়িন, লেবানন, জর্দান প্রভৃতি দেশে এবং বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার ইরানি বিপ-বের লক্ষ্যণীয় প্রভাব পড়েছে। লেবাননী ও ফিলিস্ড়িনীরা ইরানকে তাদের বড় শুভাকাঙ্খী হিসাবে গণ্য করে এসেছে বিপ-বের শুর"-সূচনা থেকেই। কারণ, ইমাম (র.) তাঁর সংগ্রামে এবং বিদেশে নির্বাসন থেকে দেশের মাটিতে পদার্পণ করার সাথে সাথে ফিলিস্ড়ি

নীদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার এবং আল কুদস বা বাইতুল মোকাদ্দাস মুক্ত করণের দাবিতে সোচ্চার হন। তিনি বলেনঃ

> *আল কুদস হচ্ছে মুসলমানদের প্রথম কিবলা, মানব জাতির ঐতিহাসিক ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মিরাজ গমনের যাত্রাস্থল। আমাদের প্রাণপ্রিয় আর কুদস এখন বড় শয়তান আমেরিকা ও ইয়াহুদি বাদী দস্যু ইসরাইলের হাতে বন্দী। প্রতিদিনই ইয়াহুদি বাদী সৈন্যের বুটের আঘাতে এবং মার্কিনী গোখরার বিষাক্ত ছোবলে আল কুদস অপবিত্র হচ্ছে। মানবতার দুশমনদের হাতে বন্দী কুদস প্রতি মুহূর্তে আহাজারী করছে (আর বলছে)-'এমন কেউ আছে যে আমাকে মুক্ত করবে'?* (নিউজ লেটার, ২০০৯ : ২৭)

তিনি আল কুদসের দাবিকে আন্তর্জাতিকীকরণের উদ্দেশ্যে **১৩৯৯** হিজরি (মোতাবেক **১৯৭৯**) সালের মাহে রামজানের শেষ শুক্রবারকে আন্ত র্জাতিক কুদস দিবস ঘোষণা করেন-যা অদ্যাবধি প্রতি বছর বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে পালিত হয়ে আসছে।

ইরান বর্ণবাদ বিরোধী দেশ। কারণ, ইসলাম বর্ণবাদ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রভৃতিকে চরমভাবে ঘৃণা করে। আর ঔপনিবেশিক ও বর্ণবাদের শিকার আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশ ইরানকে সম্মানের চোখে দেখে এবং ইরানি বিপ্লবের প্রেরণায় উজ্জীবিত-বিশেষ করে নেলসন মেন্ডেলা ও তাঁর দেশ ইরানকে তাদের বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামের সাথী বলে গণ্য করে এসেছে শুরু থেকেই।

বিশেষভাবে উলে- খ্য যে, শুধু বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথীই নয়, তারা তথা নির্যাতিত আফ্রিকাবাসী ইরানের আত্মরক্ষার যেকোনো সংগ্রামে তাঁদের সঙ্গ দিতে বদ্ধপরিকর। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ এক ঘোষণায় বলেছিলেন-'ইরানের ওপর হামলা হলে তাঁর দেশও যুদ্ধে জড়িয়ে পরবে। (নিউজ লেটার, ২০০৯ : ২৬)

অর্থাৎ ইরানের প্রতিরক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রেণের ক্ষেত্রে মানবতাবাদী দেশগুলোও-এর সাথী হতে বদ্ধপরিকর। এটা কী জাতীয় জাগরণের ইরানি বিপ- বের প্রভাব নয়? নিঃসন্দেহে হুগো শ্যাভেজ একজন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ইরানের সুখে-দুঃখে-এর সাথে থাকতে প্রস্তুত। এমনি আরো শত শত দৃষ্টান্ড় দেয়া যেতে পারে যেখানে এবং যাদের ওপর ইরানি বিপ- বের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। আসল কথা হল, ইরানি বিপ—ব একটি ন্যায়ানুগ ও আদর্শবাদী এবং অধ্যাত্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ একটি বিপ- ব আর সত্যাশ্রয়ী নীতিবান, ন্যায়পরায়ন সত্য পথে অবিচল নেতৃবর্গ ও সাধারণ মানুষ ন্যায়ের স্বপক্ষে তাদের কর্মকা" পরিচালনা করে থাকে এবং এ গুণাবলি ইরানি বিপ- বের পশ্চাতে কাজ করেছে বলে আজ-এর প্রভাব বিশ্বব্যাপী। আমরা সম্প্রতি একটি বড় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উপস্থাপনা করতে পারি যে, আমেরিকার বিগত প্রেসিডেন্ট বর্জবুশ বিশ্বব্যাপী নিন্দা কুঁড়িয়েছেন এমনকি শুধু ইরাকেই তার, বিদায় লগ্নে নিজ দেশে খোদ আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়র ও নতুন প্রেসিডেন্টকে বরণ করার উপলক্ষেও তিনি জনতা কর্তৃক অপমানিত

হয়েছেন। এটাই শুধু নয়, বরং-এর পশ্চাতে অনেক কারণ নিহিত রয়েছে-যা বিশ্ববাসীর অজনা নয়। তাকে ইরাক, আফগানিস্ড়ান এবং আরো অনেক দেশ এমনকি নিরীহ ও দেশেপ্রেমিক আমেরিকাবাসী একজন নরঘাতক ও খুনী হিসাবেই জানে। তার কারণেই বর্তমানে আমেরিকার অর্থনীতি বিধ্বস্ড় প্রায়; যার প্রভাব সারা বিশ্বে অনিবার্যভাবেই পড়েছে বলে বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহল স্বীকার করে। এদিকে জনতা ইরানি বিপ- বের নায়কের জীবদ্দশায় এবং মৃত্যু পরবর্তীকালে এমনকি অদ্যাবধি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে এসেছে। তাঁর মৃত্যু এতই গৌরবোজ্জ্বল যে, তাঁর জানাযায় এক কোটিরও অধিক লোক উপস্থিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিল। এটিও বিপ- বের প্রবাবেরই ফল।

কাজেই নিন্দনীয়কে নিন্দা এবং সম্মানীয়কে সম্মান প্রদর্শন সাধু-সজ্জনদের একটি চিরাচরিত রীতি। এ হচ্ছে নেতৃবৃন্দের প্রভাবের পক্ষে কি বিপক্ষে একটি দৃষ্টান্ড়।

উলে- খ্য যে, যে বিশ্বের জাতিগুলো প্রায়শই পরাশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিস্পোষিত হয়ে এসেছে। এ বিপ- বের প্রভাবে আজ তারাই ইরানি বিপ- বের প্রভাবের ফলে জেগে উঠতে শুর" করেছে। বিপ- বোত্তর ইরানের সফলতার কারণে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ যেমন চীন, ফ্রান্স, উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়াসহ আরো অন্যান্য রাষ্ট্র এ দেশটির সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে এগিয়ে আসছে।

বিপ্লব সাফল্যমন্ডিত হওয়ার পরপরই বিশ্বের নানা জায়গায় ইসলামি আন্দোলনগুলো এ বিপ-বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ রাষ্ট্রে এ ধরনের বিপ-ব গড়ে তোলার অভিপ্রায়কে সামনে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা সামাজিক, রাজনৈকি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোকে একত্র করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছে। আলজেরিয়ায় যে ইসলামি দলের উত্থান ঘটেছে তা মূলত এ বিপ-বের প্রেরণা থেকেই উৎসারিত। চেছনিয়া ও সুদানে মুসলমানদের জাগরণ ও বিজয় মূলত এ বিপ-বের প্রেরণারই ফসল।

ইরানের ইসলামি বিপ-বের শিক্ষা থেকেই বিশ্বের নির্যাতিত জাতিগুলো বহুলাংশে সম্বিত ফিরে পেয়েছে। তারা এ বিপ-ব থেকে পরাশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোকাবেলায় দৃঢ়তার সাথে কিভাবে দাঁড়াতে হয় সে শিক্ষা লাভ করেছে। এ চেতনার আলোকে বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকার কিউবা, ভেনিজুয়েলা, বলভিয়া, ইকুয়েডর, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও নিকারগুয়াসহ অনেক দেশেই উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সরকার গঠিত হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, এ দেশগুলো ইরান সরকারের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে-যা ইরানি বিপ-বের প্রভাবেরই ফল।

সম্প্রতি গাজায় যে যুদ্ধ হয়ে গেল এবং ইসরাইলী হায়েনাদের হামলায় তেরশরও ঊর্ধ্বে মুসলিম নারী, শিশু-যুবক নিহত হল তা বিশ্ববাসীর অজানা নেই। এ ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনীরা তাদের প্রতিরোধ করে যে বিজয় অর্জন করেছে তাতেও ইরানি বিপ-বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আলোচ্য অধ্যাগুলোতে ইসলামি বিপ□ব প্রতিষ্ঠায় ইরানের জাতীয় জাগরণের তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি বিপ-ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটি মহা গণসংগ্রাম। ইরানের ইসলামি বিপ-ব বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের মাঝে এবং যুগে যুগে নিগৃহীত জাতিসমূহের বিভিন্ন সময়ের আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ বিপ-বের আলো বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিম জনগণকে তো বটেই, এর বাইরের অপরাপর দেশ ও জাতিসমূহ যেমন, বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনাকেও প্রভাবিত করেছে। এ বিপ-ব ইরানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে এবং বিশ্ব পরিমণ্ডলে ইরানের একটি নিজস্ব ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইরান বর্তমানে একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশ। ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি ব্যবহার করছে সম্পূর্ণরূপে মানবিক কল্যাণে অর্থাৎ জ্বালানী, তাপশক্তি, ও বিদ্যুশক্তি উৎপাদন হলো শান্ড়িপূর্ণ কাজেরই অংশ। বর্তমানে ইরানে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অবয়ব আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেটি ইসলামের অবয়ব হিসাবে বিবেচনা করা যায়। একইসাথে এ বিপ–বকে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক চেতনার মধ্যে সেতু বন্ধনকারী হিসাবে গণ্য করা যায়।

এ বিপ□বের ফলে ইরানে যে ইসলামি সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত রূপ, যেখানে ইসলামকে পশ্চাৎপদ মানুষের ধর্ম হিসেবে ভাবার কোনো সুযোগ থাকে না। বিশ্ব শান্ড়ি প্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানে ইরানের ভূমিকা অত্যন্ড় ইতিবাচক। বর্তমানে ইরানের চলচ্চিত্র এতটাই উন্নত র"চিবোধসম্পন্ন, অর্থবোধক ও উচ্চ শিল্পমানসম্পন্ন– যা অষ্কার পুর"স্কারে ভূষিত হতে সাহায্য করেছে। ইরানে ইসলামি বিপ- ব মানব মুক্তির আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক দর্শনের বিস্ড়ার করেছে। এ বিপ- বের প্রাণশক্তি এক চিরন্ড়ন ও শ্বাসত শক্তি তথা আল–াহ তায়ালার অনুগ্রহ থেকে লাভ করেছে। এটা নিপীড়ক ও ষড়যন্ত্রকারী শক্তিসমূহকে সংকিত ও হতচকিত করে দিয়েছে। মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নিপীড়িত মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। এ বিপ- ব বিশ্বের বুকের সর্বজনীন, সর্বকালীন ও বাস্ড় বসম্মত উত্থান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ইরানের ইসলামি বিপ- বের ফলে ইরানি জাতি, জ্ঞান- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, সাহিত্য ও গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করেছে তেমনি ধর্ম ও নৈতিকতার আলোকে সেই অগ্রগতিকে পুত-পবিত্রতার সাথে পরিচালিত করেছে– যার সুবাস পৃথিবীর সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইরানি জাতিকে সুউচ্চ সম্মান এনে দিয়েছে। এ বিপ–ব মানুষকে মানুষের কাছাকাছি এনেছে এবং ধর্মীয় মতভেদকে দূর করেছে। এ বিপ–ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী নীতির বির"দ্ধে পৃথিবীর জাতিসমূহকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করেছে। একই সাথে ইরানি জাতিকে করেছে

স্বাবলম্বী এবং সকল চাহিদা পূরণে সক্ষম করে গড়ে তুলেছে। আর এ সবকিছুই সম্ভব হয়েছে জাতীয় জাগরেণের ফলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এ বিপ□ব প্রতিষ্ঠায় ইরানের নানামুখি জাতীয় জাগরণের প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রতিটি সেক্টরেই বিপ□ব প্রতিষ্ঠায় জনগণের জাগরণ ঘটেছে এবং জনগণের এ জাগরণের ফলে তারা স্বতস্ফূর্তভাবে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ইসলামি বিপ□বকে একটি কাঠামোগত রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পেরেছিল– যা অত্যন্ত গুর"ত্ব ও তাৎপর্য বহন করে।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি (বর্ণানুক্রমে)

১. আবদুস সবুর খান (২০১৭)। *বাংলায় ফারসি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস*, ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী

২. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (২০১৪)। ***বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব,*** ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ

৩. আমিন আল আসাদ (১৯৯৭)। ***ইমাম খোমেনী (রহ.) ও ইসলামি বিপ□ব***, ঢাকা: ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

৪. এ. বি. এম. হোসেন (২০১১)। ***মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস: অটোমন সাম্রাজ্য থেকে জাতীসত্ত্বা রাষ্ট্র,*** ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

৫. এম এ, কাউসার (২০১২)। ***মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক)***, ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী

৬. জীনাত আরা সিরাজী (২০১২)। ***ঢাকার শিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতি,*** ঢাকা: যমযম পাবলিকেশন্স

৭. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী (২০১৪)। *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা: বাড পাবলিকেশন্স

৮. তারেক মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান (২০০৮)। *ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা*, ঢাকা: কেটিথ্রি পাবলিশার্স

৯. নূর হোসেন মজিদী (১৯৯৭)। *ইসলামি রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব*, ঢাকা: ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

১০. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন (১৯৭৮)। ***ইরানের কবি***, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

১১. মুহাম্মদ কামার□জ্জামান (১৯৮১)। ***আধুনিক যুগে ইসলামি বিপ□ব***, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী

১২. মোহাম্মদ আবদুল□াহ (১৯৮২)। ***বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস***, ঢাকা: ইসলামিক ফাউ□েশন বাংলাদেশ

১৩. মোহাম্মদ গোলাম রসুল (২০১২)। *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস*, ঢাকা: আলভী প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

১৪. মোহাম্মদ ছামিরউদ্দিন (১৯৮৮)। ***ইরানে ইসলামি বিপ□ব***, ঢাকা: দীনে হক প্রকাশনী

১৫. মো. ফায়েক উজ্জামান (১৯৯৮)। ***ইরান-ইরাক বিরোধ যুদ্ধ ও সাম্প্রতিক যুদ্ধ***, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

১৬. শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী (১৯৭৯)। ***ইরান ও ইসলাম***, রাজশাহী: হিলালী ফাউন্ডেশন

১৭. সফিউদ্দীন জোয়ারদার (২০০৩)। ***আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*** (২য় খ), ঢাকা: বাংলা একাডেমি

১৮. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (২০০৪)। ***ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব***, ঢাকা: উত্তরণ

১৯. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (২০১০)। ***আধুনিক মুসলিম বিশ্বঃতুরস্ক-ইরান-আফগানিস্ড় ান***, ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস

ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি

20. *A Review of the Imposed War (*The Iraqi Regime upon the Islamic Republic of Iran) (1983). Dhaka: Embassy of the Islamic Republic of Iran

21. Azhary, M S EL. [Edited] (1984). *The Iran Iraq War: an Historical, Econoic and Political Analysis*, London: Croom Helm Ltd.

22. *Britannica Ready Reference Encyclopedia* [Edited] (2005). New Delhi: Encyclopedia Britannica (India) Pvt. Ltd.

23. E. G. Browne (1929). *A Literary History of Persia* (Vol-1), London: Cambridge University Press

24. Glenn E. Curtis and Evic Hooghund [Edited] (2008). *Iran a country study*, USA: Library of congress Cataloging-in-Publication

25. H. E. Chehabi (1999). *Iranian Politics and Religious Modernism* (The Liberation movement of Iran under the Shah and Khomeini), London: I. B. tauris and Co. Ltd.

26. *Islamic Revolution of Iran* (1991). Tehran, Iran: Islamic Propagation Organization

27. John D. Stempel (1981). *Inside the Iranian Revolution,* Bloomington, USA: Indiana Univesity Press,

28. Masih Muhajeri (1983). *Islamic Revolution: Future Path of the Nations,* Tehran, Iran: The External Liaison Section of the Central Office of Jihad-e-Sazandegi

29. Parviz Daneshvar (1996). *Revolution in Iran,* London: Machmillan Press Ltd.

30. Suroosh Irfani (1983). *Revolutionary Islam in Iran* (Popular Liberation or Religious Dictatorship), London: Zed Book Ltd.

অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ:

৩১. আবুল কাসেম ফেরদৌসি (২০১২)। ***শাহনাম*** [অনু. মনির উদ্দিন ইউসুফ], ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি

৩২. আবুল হোসেন [অনু.] (১৯৮৩)। ***ইসলামি বিপ-বের বির"দ্ধে যুদ্ধ***, , ঢাকাঃ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতি কেন্দ্র

৩৩. আয়াতুল−াহ মুতুর্জা মুতাহারী (২০০৪)। *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান* [অনু. এ. কে. এম আনোয়ার"ল কবীর], ঢাকাঃ ইলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

৩৪. *আলোর পথে* (ইমাম খোমেনীর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অসিয়তনামা) [অনূদিত (১৯৮৯)। ঢাকাঃ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

৩৫. ইয়াহিয়া আরমাযানি (১৯৭৮)। ***মধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বর্তমান*** [অনু. মুহাম্মদ ইনাম উল হক], ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি

৩৬. নূর হোসেন মজিদী [অনু.] (১৯৯৬)। ***ইরানের সমকালিন ইতিহাস***, , ঢাকাঃ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

৩৭. মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান [অনু.] (২০০৪)। ***চিরভাস্বর মহানবী (সা.)***, ঢাকাঃ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

৩৮. রইস উদ্দিন আহম্মেদ [অনু.] ***জাতিসমূহের আগামী দিনের পথ ইসলামি বিপ−ব***, ঢাকাঃ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কতিক কেন্দ্র

৩৯. সৈয়দ হোসাইন মোহাম্মদ জাফারী (১৯৯২)। ***শিয়া মাজহাবের উৎপত্তির ইতিহাস***, [অনু. মনজুর আলম], ঢাকাঃ মাসুম পাবলিকেশন

৪০. হামিদ আলগার (১৪৩৩ হি.) : ***ইসলামি বিপ□ব ইরান দেশে*** [একদল অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত], ঢাকা: ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

৪১. হোসেইন ফেরদৌস্ত (২০০১): ***পাহলভি রাজবংশের উত্থান পতন*** (হোসেইন ফেরদৌস্তের স্মৃতিচারণ) [অনু. সালাহ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী] ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী

পত্রিকাসমূহ

৪২. দৈনিক আজকের কাগজ, ১১ অক্টোবর, ১৯৯৫

৪৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ অক্টোবর, ১৯৯৫।

৪৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ আগস্ট ২০১২।

৪৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ১ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

৪৬. বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, (২০০৯): ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ***(ইরান ইরাক যুদ্ধে (১৯৮০-১৯৮৮ বাংলাদেশের ভূমিকা)***, সংখ্যা ৩১-৩২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪৭. নিউজ লেটার (এপ্রিল, ১৯৮৬)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৪৮. নিউজ লেটার (মার্চ, ১৯৮৮)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৪৯. নিউজ লেটার (মার্চ, ১৯৯১)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৫০. নিউজ লেটার (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৯১)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৫১. নিউজ লেটর (আগস্ট, ১৯৯৫)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৫২. নিউজ লেটার (অক্টোবর, ১৯৯৫)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৫৩. নিউজ লেটার (মার্চ, ১৯৯৬)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৫৪. নিউজ লেটার (ফেব্র□য়ারি, ১৯৯৭)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৫৫. নিউজ লেটার (জানুয়ারি, ১৯৯৮): ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৫৬. নিউজ লেটার (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৮)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৫৭. নিউজ লেটার (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৯৯)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৫৮. নিউজ লেটার (জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি, ২০০০)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৫৯. নিউজ লেটার (জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি, ২০০১)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৬০. নিউজ লেটার (মে-জুন, ২০০২)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৬১. নিউজ লেটার (জুলাই-আগস্ট, ২০০২)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৬২. নিউজ লেটার (মে-জুন, ২০০৩)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৬৩. নিউজ লেটার (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০৯) ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৬৪. নিউজ লেটার (আগস্ট, ২০১২)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৬৫. নিউজ লেটার (মে-জুন, ২০১৩)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৬৬. নিউজ লেটার (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৪)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৬৭. নিউজ লেটার (মে-জুন, ২০১৫)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৬৮. নিউজ লেটার (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭): ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৬৯. নিউজ লেটার (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০১৮): ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা